পশুপাখী ও পতঙ্গদের গপ্পো

সুধাংশু পাত্র



পশুপাখী ও পতঙ্গদের গপ্‌পো

পশুপাখী ও পতঙ্গদের গপ্পো

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
জানুয়ারী, ১৯৮৯

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১ বি রাজা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

দাম : ১৫ টাকা
Rupees Fifteen only

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম শিশু-সাহিত্যিক
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীচরণ কমলেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই :

বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা
মনের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
জীবজগতের বিস্ময়
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
আজকের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
বিজ্ঞানের সহজপাঠ
মহাসাগরের মহাবিস্ময়
খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু
সভ্যতার আদিপর্বের আবিষ্কার ও তৎপরতা

সূচী

সাথী

শীতের শুরু। ঝিরঝির করে ঝরছে তুষার। সাদা সাদা বরফে ঢেকে গেছে চারদিক। দুপুর ছাড়া দিবাকরকে দেখাই যাচ্ছে না। আর কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় হাড়েও যেন কাঁপন ধরছে।

পাহাড়ের চূড়ায় যেসব হাঁস থাকতো, তাদের এবার ঘরে টেঁকা দায় হয়ে পড়লো। বড়োরা ছোটোদের জানিয়ে দিলে—ওরে কে কোথায় আছিস, নেমে আয়, নেমে আয়! ঘর ছাড়ার সময় হয়েছে এবার। দল বাঁধতে হবে, দু চারদিন ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, তৈরি হতে হবে দক্ষিণ মহাসাগরে পাড়ি দেওয়ার জন্যে। কুঁড়ে হয়ে বসে থাকার সময় যে আর নেই রে!

বড়োদের কথা শুনে তরুণরা নেমে এলে একে একে। পাহাড়ের চূড়ো থেকে দূরে—অনেক দূরে, পাহাড়তলির জলাগুলো ছেয়ে গেল হাঁসে হাঁসে। এখানে এখনও বরফ জমেনি, তুষার পড়ছে না, কনকনে শীতও ততটা নয়। কিছুদিন পরে এখানেও যখন বরফ জমতে শুরু করবে, তখন ওরা দলে দলে ভাগ হয়ে যেতে শুরু করবে অনেক—অনেক দূরে, সেই নীল নীল সাগরের দেশে, সেই দক্ষিণ মহাসাগরে জেগে ওঠা দ্বীপগুলোর দিকে। সেখানে হৈ-হল্লা করতে করতে কাটিয়ে দেবে কয়েকটা মাস। ডিম পাড়বে, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবে, খেয়ে দেয়ে গায়ে চর্বিও জমিয়ে ফেলবে। অবশেষে বাচ্চারা বড়-সড় হয়ে উঠলে এবং এখানেও শীত পড়তে শুরু করলে পুনরায় ফিরে যাবে দেশে। কী আনন্দ, কী আনন্দ!

যারা তরুণ, অভিযানের নেশা যাদের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়, ঘরে বসে না থেকে যারা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাযাবরের মত কেবল ঘুরে বেড়াতে চায়, তারাই আগেভাগে বেরিয়ে পড়লে। তারপর

পাহাড়তলির জলাগুলোও যখন বরফে বরফে ঢেকে গেল তখন বুড়ো ও অসুস্থরাও বাধ্য হল ঘর ছাড়তে। ক'দিনের ভেতরেই একেবারে খালি হয়ে গেল পাহাড়তলি।

শুধু আনন্দ ছিল না একজোড়া সোনালী হাঁসের মনে। তাদের একটিকে অনেক আগে থেকে রোগে ধরেছিল। ভেবেছিল, পাহাড়তলিতে কয়েকটা দিন ঘুরে বেড়াতে পারলে এবং ভাল ভাল খাবার খেলে অসুখটা সেরে যাবে। কিন্তু হায়রে হায়! বড়োদের কাছ থেকে কত ওষুধ এনে খেলে, কত ঝর্ণার জলে ডুব দিলে, কত ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করলে, তবু রোগ তার সারলে না। অবশেষে উপায় না দেখে একদিন তারাও আকাশের বুকে মেলে দিলে ডানা।

রোগা হাঁসটার দিনে ও রাতে একটানা উড়ে চলার ক্ষমতা ছিল না। আঁধার নেমে এলে ওকে নিয়ে সাথী হাঁসটি নেমে পড়তো কোন না কোন জলার ধারে। রাতটা বিশ্রাম করতো, তারপর ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় উঠে যেতো আকাশে।

একদিন, দুদিন করে প্রায় একটা মাস কেটে গেল। ততদিনে রোগা হাঁসটা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবার ডানার ঝাপটা লাগালে হাঁফ ধরে, ডানা মেলে ভেসে থাকলে মাথা ঘোরে, জোরে একটু হাওয়া দিলেও টাল সামলাতে কষ্ট হয়। লোকালয়ের উপর দিয়ে উড়তে হচ্ছে বলে যখন তখন যেখানে সেখানে নেমে পড়ারও উপায় নেই। বিজলীবাতির আলোয় চোখে ধাঁধা লাগার ভয়, টেলিফোন টাওয়ারে হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভয়, তার উপর আছে শিকারীদের ফাঁদ ও বন্দুকের ভয়।

তবু নামতে হল তাদের। শহর থেকে দূরে বিরাট এক দিঘীর পাড়ে হাজার বছরের পুরোন এক বটগাছ দেখে নেমে পড়লে সেইখানেই। এখানে শীত খুব কম, তুষারপাত আদৌ নেই, দিঘীতে মাছগুগলিও যথেষ্ট। ভাবলে তারা, দিনের বেলাটা বটগাছের ঘনপাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে এবং রাতে দিঘী থেকে খাবার তুলে খাবে।

কয়েকটা দিন এইভাবে কাটাতে পারলে মনে হয় বাকি পথটা পাড়ি দিতে রোগা হাঁসটার কোন অসুবিধে হবে না।

দিঘীর পাড়েও কেটে গেল কতদিন! তবু রোগা হাঁসটা একটুও বল ফিরে পেল না। এবার খেতে কষ্ট, জলে সাঁতার কাটতে কষ্ট, এমনকি বটের ডালে চুপচাপ বসে থাকতেও কষ্ট। সে ভাল করেই বুঝতে পারলে, দিন তার ঘনিয়ে এসেছে।

একসময় চোখদুটো তার জলে ভিজে গেল। মনের কোণে ভেসে উঠলো হারানো দিনের কত টুকরো টুকরো ছবি। প্রতিবছর শীতের শুরুতে দলবেঁধে দক্ষিণ মহাসাগরের দিকে ছুটে যাওয়া, কলগানে আকাশ বাতাসকে ভরিয়ে দেওয়া, নীল নীল সাগরের তীরভূমিতে সাগর-কচ্ছপদের খেলা দেখা,—না, আর কোনদিনই তার কপালে এসব জুটবে না।

নির্জন দ্বীপগুলোর ছবিও একবার উঁকি দিয়ে গেল মনে। হয়ত এতদিনে পাখীদের হাট বসে গেছে সেখানে, কতদেশ থেকে কতজনে আসছে, জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডিম পাড়তে শুরু করে দিয়েছে এবং চিৎকার ও চেঁচামেচিতে সাগর তোলপাড় করে ছাড়ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাথীকে জিজ্ঞাসা করলে রোগা হাঁসটি—সাগর আর কত দূরে ভাই?

সাথী হাঁসটি বললে—এখনও যে অনেক দূরে!

—কতটা পথ পার হয়ে এসেছি আমরা?

—আমাদের সেই শীতের দেশ সাইবেরিয়া ছেড়ে, কত নগর—কত রাজধানীকে পেছনে ফেলে, লাল লাল পাথরের দেশ পার হয়ে সেই কবে আমরা প্রবেশ করেছি দেশের সেরা অপরূপা ভারতবর্ষে। ভূস্বর্গকে বামে রেখে, পঞ্চনদীর তীরে গুরুদের দেশ হয়ে, সেকালের মুনিঋষিদের তপোবনগুলিকে প্রণাম জানিয়ে আরও চলে এসেছি ভেতরে। ডাইনে ও বামে পর পর ছেড়ে এসেছি জগতের উচ্ছৃঙ্খলা ও লোভ-হিংসার শোচনীয় পরিণতির নিদর্শন সাগরগর্ভে নিমজ্জিত দ্বারকা ও মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রকে। তারপর বীরের দেশ রাজভূমি রাজস্থানকে

অতিক্রম করে সবে প্রবেশ করেছি চির আরাধ্যা গঙ্গা ও যমুনার দেশে—বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দেশে—ঠাকুর রাম ও কৃষ্ণের লীলা-ভূমিতে। ডাইনে সাদা সাদা মার্বেলের দেশে নগাধিরাজ বিন্ধ্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকায় পথকে আমাদের বাঁকাতে হয়েছে।

—এরপর আর কতদেশ পার হতে হবে আমাদের!

—এরপরই পড়বে অজস্র পাহাড়ঘেরা বিষ্ণুক্ষেত্র। ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম জানিয়ে, মা কালীর মহিমাধন্য সোনা সোনা ধানের দেশ বাংলায় প্রবেশ করবো। তারপর বামে কামাখ্যা ও ত্রিপুরেশ্বরীকে বন্দনা করে একটানা ছুটে চলতে হবে সাগরবেলা ধরে। নীলাচলে নীল-মাধবকে প্রণাম জানাবো, পঞ্চম পাণ্ডবের বংশধরদের দর্শন করবো, চন্দনের দেশকে ডাইনে রেখে পক্ষীতীর্থ হয়ে ছুটবো মীনাক্ষী মায়ের দেশে। অবশেষে কুমারী কন্যার আশিস শিরে ধারণ করে ছুটবো সোজা দক্ষিণে—একেবারে সাগরের উপর দিয়ে। একটানা পনেরটা দিন উড়তে পারলেই নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে এসে পড়বো মকরক্রান্তি অঞ্চলে। সেখানে সূর্য এখন লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে, জনহীন দ্বীপগুলোতে বসে গেছে পাখীদের মেলা—আর মাত্র মাসখানেকের পথ।

রোগা হাঁসটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে একবার উদাস দৃষ্টিতে তাকালে আকাশের পানে। করুণকণ্ঠে সাথীকে বললে—আমার আর তো ওড়ার ক্ষমতা নেই ভাই! এবছর তুমি একাই চলে যাও সাগরে। আমি এইখানেই থেকে যাই।

সাথী হাঁসটি বললে—তা তো হয়না ভাই! তোমাকে একা একা ফেলে আমি কিছুতেই যাবো না। কয়েকটা মাস তোমার সঙ্গে আমি এইখানেই কাটিয়ে দেবো। একটা বছর নাই বা গেলাম সাগরে।

বড় কষ্টেও হাসলে রোগা হাঁসটা। বললে—জায়গাটাকে আদৌ নিরাপদ মনে হচ্ছে না। আজকেই একদল মানুষ আমাদের দেখে ফেলেছে বলে মনে হল। তারা হয়ত বিকেলে বন্দুক নিয়ে আসবে আর আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।

একটু নীরব থেকে রোগা হাঁসটি পুনরায় বললে—আমাকে তো আজ না হয় কাল মরতে হবেই। অবুঝ হয়ো না। মৃত্যু যার শিয়রে, তাকে আগলে রেখে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না। কথা রাখ, একাই যাও। ফেরার পথে পারো তো একটু খোঁজ নিও আমার। যদি বেঁচে থাকি তাহলে শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করবো তোমারই জন্যে।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলার পর রোগা হাঁসটা যেন হাঁপিয়ে উঠলে। মৃদু হেসে সাথীটি তাকে বললে—ছেড়ে যাওয়ার অনুরোধ তুমি আর করো না। একা একা কালকাটানো মৃত্যুর সামিল। তোমাকে ফেলে রেখে একা আমি কিছুতেই যেতে পারবো না।

রোগা হাঁসটা চুপ করে রইলে। কিন্তু মনে শান্তি পেলে না একটুও। উপায় খুঁজতে লাগলে সাথীটিকে বাঁচানোর জন্যে। বার বার অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ, রাম ও কৃষ্ণকে মনে মনে মিনতি জানালে, শিকারীরা আসার আগে তার যেন মৃত্যু হয় এবং সাথীটি যেন ছেড়ে চলে যায়।

বিকেল হল। দুটি হাড়-জিরজিরে ছেলের হাত ধরে এক ভিখারিণী এসে দাঁড়ালে সেই বটের তলায়। আঁচল থেকে কতকগুলো শাকপাতা খুলে রাখলে মাটিতে। তারপর ছোট্ট পুঁটলিটা থেকে কালো কুচকুচে একটা হাঁড়ি বার করে এক হাঁড়ি জল আনলে দিঘী থেকে।

ইট ঘিরিয়ে একটা উনানও খাড়া করলে ভিখারিণী। তারপর বটের শুকনো ডাল ভেঙে উনান ধরালে। একটু পরেই নাচতে শুরু করে দিলে লকলকে আগুনের শিক্ষা। শীতের আগুন। আনন্দে শিখাগুলো যেন আকাশে বিলীন হতে চাইলে। অথবা হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানালে রোগা হাঁসটাকে।

উনানে হাঁড়ি তখনও চাপেনি। আগুনের চোখ-ভোলানো রূপ দেখে রোগা হাঁসটা মুহূর্তে তার কর্তব্য স্থির করে ফেললে। ভাবলে, একদিনের জন্য হলেও হতভাগা ছেলেদুটোর মুখে একটু হাসি ফোটানো যাবে, আর সাথীটিও রক্ষে পাবে। এই শুভক্ষণটির সদ্ব্যবহার করতেই হবে তাকে।

'ঝুপ' করে একটা শব্দ হল। সাথী হাঁসটি বোধ হয় ঘুমোচ্ছিল তখন। সচকিত হয়ে তাকাতে দেখতে পেলে পাশে তার সাথী নেই। ছেলেদের কলরবে উনানের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখ দুটো তার স্থির হয়ে গেল। তখনও উনানের ভেতর একটু একটু করে ডানা নাড়ছে তার সাথীটি, আর সোনালী অঙ্গটা তার একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

বুকফাটা হাহাকার করতে করতে সেও নেমে এলে গাছ থেকে। অবশেষে সেই সোনালী আলোর শিখায় সেও পেতে দিলে তার সোনালী ডানাদুটিকে।

নেকড়ে-মা

গ্রীষ্মের এক গভীর রাত। পশু-পাখীরা যে যার বাসায় গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। কেবল জেগে আছে দিনের বেলায় যাদের চোখে ধাঁধা লাগে, রাত্রিতে যারা গাছের মগডালে মগডালে ঘুরে ঘুরে পাখীদের বাচ্চা চুরি করে খায়, যারা তাল খেজুরের ডগায় বসে ইঁদুরের গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর যারা ধ্যাবড়া কানে দূরের ক্ষীণ শব্দকেও ধরতে পারে—সেইসব কোটরবাসী নিশাচর হুতোমরা।

হঠাৎ তাদের কোন একজন দেখতে পেলে, দূরে—বহুদূরে—বনের একেবারে প্রান্তসীমায় দপ দপ করে ফুটে উঠলো জবাফুলের মত লাল লাল আগুনের গোলা। সঙ্গে সঙ্গেই সে জুড়ে দিলে চিৎকার—ওগো বনের পশু-পাখীরা, তোমরা জেগে ওঠো, জেগে ওঠো! উত্তরের পাহাড়ের কোলে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে।

এবার বনে যত হুতোম ছিল তারা সবাই তাকালে উত্তর দিকে। আর তাকানো মাত্রই শুরু করে দিলে হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি।

বনের ভয় দাবানলকে। এ বনে আবার আঠাওয়ালা গাছের সংখ্যা বেশী হওয়ায় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ভয়াবহ আকার ধারণ করে সহস্র সহস্র রাক্ষসীর মত উল্কাবেগে ছুটে আসে। তাই তো হুতোমদের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল সবার।

সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে পশু-পাখীরা যখন তাকালে তখন দেখলে, এরই মধ্যে উত্তরের আকাশটা সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠেছে, জবা-ফুলের সহস্র সহস্র মালা পরেছে গাছপালা, বিদ্যুৎবেগে ছুটছে আগুনের ফুলকি, প্রবল হয়ে উঠেছে উত্তুরে হাওয়া, ভেসে আসছে কট্‌কট্‌ শব্দ, আর ধূনার গন্ধে ভরে উঠেছে চারদিক।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে উঠলে সবাই। তারপর আগুনের সঙ্গে

পাল্লা দিয়ে শুরু করলে ছুটতে। ছুট্-ছুট্-ছুট্, পাইনবনকে ডাইনে রেখে, শাল-মহুয়ার বন ছেড়ে, কালি নদীর বাঁক ঘুরে—একেবারে সোজা দক্ষিণে—দিগন্তবিস্তৃত সেই মাঠটার পানে।

একা একা যাদের ছুটতে হলো তাদের বিশেষ বেগ পেতে হলো না। এক এক লাফে এক একটা বন পার হয়ে গেল। কিন্তু অসুবিধায় পড়লে বাচ্চা-কোলে মায়েরা। বাচ্চাদের ধমক দিয়ে, সামলে-সুমলে, পেটের তলায় জাপ্টে আগুনের হল্কার ভেতর দিয়ে ধীরে-সুস্থে ছুটতে হলো তাদের।

এক নেকড়ে-মা আসছিল পেটের তলায় তিন-তিনটে বাচ্চাকে ঝুলিয়ে। শাল-মহুয়ার বনের পরে একফালি যে ফাঁকা জায়গাটা আছে—সেইখানে দেখলে, দুটি নিতান্ত কচি হরিণশিশু আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলই কাঁপছে আর একটু দূরে মা-হরিণটা অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

নেকড়ে-মা মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করলে না। খপ করে হরিণশিশু-দুটোকে তুলে নিয়ে গুঁজে দিলে পেটের তলায়। তারপর আগের মত শুরু করলে ছুটতে।

এবার পাঁচ-পাঁচটে বাচ্চাকে সামলাতে গতি তার মন্থর হলো। হরিণশিশুরা পেটের তলায় ঝুলতে অভ্যস্ত নয় বলে সামনের একটা পা'কে প্রস্তুত রাখতে হলো—যাতে ওরা পড়ে না যায়। তিন পায়ে কত জোরে আর ছুটবে সে!

তবুও জীবনমরণ পণ করে ছুটতে হলো নেকড়ে-মাকে। ততক্ষণে আগুনের হল্কা লেগে লেগে পিঠের চামড়া স্থানে স্থানে পুড়ে গেছে, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বন্ধ হয়ে আসছে নাক, পিঠের উপর এসে পড়ছে আগুনশুদ্ধো ডালপালা, তবুও যেন ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

অবশেষে কালি নদীর বাঁকটা ঘুরতেই সে চোখে অন্ধকার দেখলে। মাথা ঘুরে পড়ে গেল সেইখানেই। বললে—তোমরা পাঁচজনে মিলে আমার বুকের দুধটুকু তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। তারপর দুজনে দুটো হরিণশিশুকে ঘাড়ে করে ছুটে যাও ঐ ফাঁকা মাঠে।

নেকড়ের বাচ্চারা শুধোলে—মা, তুমি ?

নেকড়ে-মা বললে—আমার তো আর যাওয়া হবে না বাছারা ! এইখানে আমাকে মরতে হবে ।

কাঁদো কাঁদো হয়ে তারা বললে--কেন তুমি লোভের বশে ঐ হরিণশিশুদের আনতে গেলে ! কী লাভ হবে এত্তোটুকুন হরিণশিশু-ছুটোকে খেয়ে !

অতিকষ্টেও হাসলে নেকড়ে-মা। বললে—ওদের খাওয়ার জন্য আনিনি বাছারা ! বিপদের দিনে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক রাখতে নেই । তখন সবাই সবার বন্ধু । ওদের বংশকে বাঁচিয়ে না রাখলে তোরাই-বা বাঁচবি কেমন করে বল ?

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে নেকড়ে-মা হাঁপিয়ে উঠলে। শেষে বললে—আর দুধ খেতে হবে না। তোদেরই মতো মা-হারা হরিণশিশু-ছুটোকে দুজনে কাঁধে করে যত জোরে পারিস ছুটে যা। সেখানে কোন এক হরিণ-মাকে দিয়ে দিবি ওদের।

মায়ের কথা মত বাচ্চারা ছুটে গেলে মাঠের দিকে। আর তক্ষুণি ভয়ঙ্কর এক আগুনের ঝাপটায় চিরকালের জন্য নিথর করে দিলে নেকড়ে-মায়ের দেহটাকে ।

খোকার সাহস

খোকা ভারি দুষ্টু! দুধ খায় না, পড়ায় মন দেয় না, মায়ের কথা একেবারে শোনে না। শুধু আজে বাজে বায়না ধরে। সেদিন রাতে খোকা যখন কিছুতেই দুধ খেলে না, তখন মা রেখে বললেন—অ্যাই বাঘ, খোকাকে ধরে নিয়ে যা তো!

জানালার ওপাশে চুপটি করে বসে ছিল ইয়া বড় এক কেঁদো বাঘ। গায়ে তার কালো কালো ডোরা। মস্তবড় হাঁড়ির মত মুখটায় দু-হাতি লম্বা গোঁফজোড়া। বুড়ো হওয়ায় এখন আর বনবাদাড় ভেঙ্গে হরিণদের পেছু পেছু ধাওয়া করতে পারে না, নদীতে নদীতে গলা জলে নেমে মাছ ধরতে পারে না, লাফ দিয়ে মৌচাক আঁচড়ে মধুও ঝরাতে পারে না। কেবল বোকা মানুষকে ঘায়েল করতে সারারাত মানুষেরই ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। আজ খোকার মায়ের কথাশুনে বেজায় খুশি হলে বাঘটা।

খোকার মা একসময় খোকাকে ঘরের ভেতরে ঘুম পাড়িয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর ছেড়ে। খোকা কিন্তু আদৌ ঘুমায়নি। কেবল ঘুমের ভান করে চুপচাপ বিছানায় পড়ে ছিল। মা বেরিয়ে যেতে একবার পিটপিট করে তাকালে চারদিকে। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ঘরময় শুরু করে দিলে পায়চারি। আর তখনই বারান্দায় পড়ে থাকা খোকার মায়ের একখানা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাঘটা তার হেঁড়ে গলাটাকে মিহি করে অতি মোলায়েমভাবে ছড়া কেটে বললে—

আয়রে খোকা আয়,
সময় বহে যায়,
ফুল পাড়বি, পাখী ধরবি,
রাঙা বনে খেলা করবি,
টের পাবে না মায়।

খোকা শুধোলে—তুমি কে গা!

জুল জুল করে তার দিকে তাকিয়ে বাঘ বললে—চিনতে পারলি নে! আমি যে তোর মাসি! আয়, আয়, তাড়াতাড়ি দোর খুলে বেরিয়ে আয়!

ফুল, পাখী আর রাঙা বনের নাম শুনে খোকার ভারি লোভ হল। সদর দরজার শেকল খুলে বেরিয়ে আসতেই বাঘ বললে—চুপি চুপি আমার পিঠের উপর চেপে বোস্। বুড়ো হয়েছি, বাতের শরীর। তাই তোকে পিঠে করে হামাগুড়ি দিতে দিতে যাবো। তুইও ঘোড়ায় চড়ার মজা পাবি।

খোকা ভাবলে, কী মজা! কী মজা! চোখের পলকে সে চেপে বসলে বাঘের পিঠের উপরে। বাঘও খুশিতে ডগমগ হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেলে। পায়ের তলায় গাদা মাংস থাকার জন্যে পায়ের শব্দ কেউ পেলে না, গায়ে শাড়ী জড়িয়ে ফেলায় বোটকা গন্ধও উঠলে না, আর লোকজনদের সামনে পড়তে হবে বলে সদর রাস্তা দিয়েও গেলে না বাঘটা। খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে, সোনাডাঙ্গার মাঠ পেরিয়ে, কাজলাদিঘীর পাড় ঘেঁষে, তপসে নদীর চর ঘুরে, সোজা ছুটে চললে বনের দিকে।

একসময় খোকার কেমন যেন সন্দেহ হল। সে ভাল করে মাসির দিকে তাকালে একবার। আঁধারে সবকিছু ঠাওর করতে না পারলেও বুঝতে পারলে, মাসির ঘুমটা হাঁড়ির মত, গায়ে লম্বা লম্বা চুল, আর কেমন যেন বোটকা বোটকা গন্ধ! খোকার কেমন যেন খটকা লাগল মনে। শুধোলে—আচ্ছা মাসি! মানুষের গায়ে তো চুল নেই, লেজও নেই। তোমার গা-ভরা চুল কেন? অত বড় লেজ কেন? গায়ে এমন বিছ্ছিরি গন্ধই বা কেন?

বন তখনও দূরে। মানুষদের আর মাত্র একটা পাড়া পেরুলেই বনের সীমানা। বাঘ তাই হো হো করে হেসে বললে—

বুড়ো হয়েছি, থুড়ো হয়েছি,
কম্প ধরে গায়।

কেঁদো বাঘের চামড়া এনে
গায়ে জড়িয়েছি তায়।

খোকা বললে—তা না হয় হল। কিন্তু এত বড় কান কেন তোমার ?

বাঘ বললে— খোকা,
তুই বেজায় বোকা।
বয়স গেছে বেড়ে,
বোনপোদের কথা শুনি
নকল কান জুড়ে।

বাঘ আবার হাসলে। এবার তার দাঁতগুলো দেখে বেজায় ভয় পেলে খোকা। শুধোলে—তোমার অমন দাঁত কেন মাসি ?

বন তখন আর বেশি দূরে নয়। সামনেই হিজল ও বটের সারি। পাকুড়তলাটা পার হতে পারলেই পড়বে কেয়াঝোপে ঘেরা তার আস্তানা। এবার তার জিভ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করলে। খুশিতে ডগমগ হয়ে ফ্যা ফ্যা করে হেসে উঠলে। তার সেই হাসি আর মূলোর মত দাঁতগুলোকে দেখে খোকা ভয় পেলে বেজায়। গায়ে তার কাঁটা দিয়ে উঠলে। হাসি থামিয়ে বাঘ বললে—

মাসি নইরে, মাসি নইরে,
আমি বনের বাঘ।
কচি ছেলের মাংস খেতে
মনে জেগেছে সাধ।
তাইতো তোরে এনেছি ধরে
খাবো আজকে পেটটি পুরে
মিটবে মনের সাধ।
আমি বনের বাঘ।

এবার বেজায় ভয় পেলে খোকা, কিন্তু একটুও ভড়কালে না। সুযোগ খুঁজতে লাগলে কেমন করে বাঘের চোখে ধুলো দেওয়া যায়।

একসময় বাঘটা যখন হেলতে দুলতে বটতলা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল,

তখন বটের মগডাল থেকে ঝুলে পড়া ঝুরিগুলো দেখে খোকার মাথায় তড়াক্ করে এক বুদ্ধি এসে গেল। একলাফে একটা ঝুরি ধরে দিলে এক দোল। অমনি নাগালের ভেতরে এসে পড়লে বটের মোটা একটা ডাল। খোকা ডালটিকে ধরে তরতর করে বেয়ে গেল এক্কেবারে উপরে।

আচমকা এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় বাঘ প্রথমটায় এক্কেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপর শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে দেখে রাগে গরগর করতে করতে মাটিতে খুব করে লেজ আছড়ালে। 'হালুম' 'হালুম'ও করলে বার কয়েক।

খোকা হিহি করে বেশ একচোট হেসে নিলে। বললে—কী গা মাসি! এত রাগ কেন? আমার কচি মাংস খাবে যে? ছাই খাও!

বাঘ আরও রেগে উঠলে। খোকাকে ধরার জন্য শুরু করে দিলে লাফ দিতে।

বটের গুঁড়িতে ছিল ইয়া বড় এক ভীমরুলের চাক। বাঘের তা জানা ছিল না। কাদামাটি দিয়ে বানানো চাকটা এক্কেবারে গাছের গুঁড়ির মত ছিল কিনা? বাঘ তাই বুঝতেই পারেনি। কিন্তু তার নখের আঁচড় লেগে চাক গেল ভেঙ্গে। আর হাজার হাজার ভীমরুল তাকে ঘিরে ফেললে।

বাঘ তখন আর কী করে? ভীমরুলদের কামড় খেয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করলে। কিন্তু ভীমরুলেরা তাকে ছাড়বে কেন? বাঘ তাদের ঘর ভেঙ্গেছে, তাদের হাজার হাজার ডিম ও শূককে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, কত দিনের সংগ্রহ করা খাবারকেও নষ্ট করে দিয়েছে। তাই আরও জোরে, আরও জোরে হাজার হাজার ভীমরুল হুল ফোটাতে ফোটাতে বাঘটাকে এক্কেবারে মেরেই ফেললে।

সকালে কাঠুরিয়ারা বনে কাঠ কাটতে এসে দেখে অবাক কাণ্ড! মস্তবড় এক কেঁদো বাঘ মরে পড়ে আছে আর

গাছের ডালে খোকা বসে বসে কাঁদছে। কাঠুরিয়ারা খোকাকে গাছ থেকে নামিয়ে আনলে। সব শুনে তারা খুব তারিফ করলে খোকার।

খোকার মা ততক্ষণে কেঁদে কেঁদে চোখগুলো রাঙা করে ফেলেছে আর ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছে। কাঠুরিয়াদের সাথে খোকা ফিরে এসে একেবারে সোজা ছুটে গেল মায়ের কাছে। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললে—মাগো! আর কখ্খনো আমি দুষ্টুমি করবো না। দেখে নিও!

পিঁপড়ের দলে খোকন

চৈত্র মাস। ছোট ছোট গুটিতে ভরে গেছে উঠানের আমগাছটা। নুন দিয়ে কচি আমকে জিরিয়ে খেতে খোকনের ভারি লোভ। কিন্তু মায়ের জন্য পারে না সে আম পাড়তে।

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মা ঘুমোচ্ছিলেন। খোকন পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এবং এদিকে ওদিকে বার দুই তাকিয়ে তরতর করে উঠে গেলে আম গাছে।

সেই আমগাছটাতে ছিল লাল পিঁপড়েদের বাসা। পাতাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে গোল গোল চমৎকার সব ঘর বানিয়েছিল আর শত্রু হঠাতে গাছময় দলে দলে পায়চারি করছিল।

খোকন যেই একটা ডালে পা দিয়েছে, অমনি হাজার হাজার পিঁপড়ে কোথা থেকে ছুটে এসে চেপে বসলে খোকার উপরে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তার হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে, সবজায়গায় জ্বালা ধরিয়ে দিলে।

চিৎকার করতে করতে একলাফে গাছ থেকে নেমে এলে খোকন। কিন্তু পিঁপড়েরা তখনও চেপে বসে আছে আর কুট্ কুস কুট্ টুস করে কামড়াচ্ছে। খোকন আর কী করে? চিৎকার করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করলে।

খোকনের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল মায়ের। ছুটে এসে অনেক কষ্টে পিঁপড়েগুলোকে ছাড়ালেন। তারপর খোকনকে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। কতক্ষণ কান্নাকাটির পর তবেই খোকন চোখের পাতাদুটো বন্ধ করতে পারলে।

একসময় খোকন দেখলে, কড়ে আঙ্গুলের ডগার মত দুটো কালো কালো বিছ্ছিরি পিঁপড়ে ছুটে এলে তার বিছানার কাছে। ভয়ে

শিউরে উঠলে খোকন। বললে—সরে পড় বলছি! নইলে ভাল হবে না।

পিঁপড়েরা বললে—আমাদের দেখে মিছেই ভয় পাচ্ছো। আমরা আমগাছের সেই তাঁতী পিঁপড়ে নই। আমরা চাষী পিঁপড়ে—থাকি গর্তের ভেতরে। তোমার সঙ্গে মিতালি করতে এসেছি।

খোকন বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে—খবরদার কাছে এসো না। এক্ষুণি তাহলে পুলিসে ফোন করবো। দেখছো না, ঘরে ফোন আছে আমার।

হাসলে পিঁপড়েরা। বললে—কী আর পুলিশের ভয় দেখাচ্ছো খোকন! আমাদের দেহরস ফেরোমোনের কথা নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। একটু ছড়িয়ে দিলেই হাজার হাজার আমাদের মত ডেঁয়ো পিঁপড়ে ছুটে আসবে। ফোন করতে যাওয়ার ফুরসৎই পাবে না। তার চেয়ে চুপ কর, আর ভাল ছেলের মত আমাদের বন্ধু হয়ে আমাদের রাজ্যে চল।

খোকনের পিঁপড়েদের দেশ দেখতে কেমন যেন লোভ হল। তবু বললে—তোমরা আমায় কামড়াবে না তো?

—আরে রাম! তোমাদের মানুষের মত আমাদের এমন হিংসুটে স্বভাব নয়। বন্ধুর জন্য আর নিজের দলের জন্য আমরা প্রাণও পর্যন্ত পণ করে থাকি। তার প্রমাণ তো এইমাত্র পেয়েছো তাঁতী পিঁপড়েদের কাছে।

খোকন মুখটা ব্যাজার করে বললে—তাঁতী পিঁপড়েরা ভারি হিংসুটে। আমি আম পাড়তে গাছে উঠেছিলাম। ওদের ক্ষতি করতে যাইনি। তবু ওরা কামড়ালে।

পিঁপড়েরা বললে—গাছ ওদের দয়া করে ঠাঁই দিয়েছে, আর তুমি যাচ্ছো গাছের অনিষ্ট করতে। তারা তোমায় বাধা দেবে না? বল কী তুমি?

খোকন কথাটা ভেবে দেখলে। তারপর বললে—চল, বেরিয়ে পড়া যাক।

পিঁপড়েরা তখন খোকনের কড়ে আঙ্গুলটা আচ্ছা করে কামড়ে ধরলে। খোকন উঃ আঃ করে উঠলে। বললে—এ কী? তোমরা আমাকে কামড়াচ্ছো কেন!

পিঁপড়েরা বললে—তোমাকে আমাদের মত পিঁপড়ে করে ফেলতে হবে না? তা না হলে আমাদের দলে ভিড়বে কেমন করে?

খোকন আঁৎকে উঠলে। কিন্তু ততক্ষণে পিঁপড়েরা ফুসমন্তর শুরু করে দিয়েছে—

কুট্‌টুস কাট্‌টুস কুট্‌টুস টুস্
ফুস্‌মন্তর ফুস্‌মন্তর ফুস্‌মন্তর ফুস্।
আয়রে ফেরোমোন এসে যা
খোকাকে পিঁপড়ে করে যা।

দেখতে দেখতে খোকনের শরীরটা এত্‌তো টুকু হয়ে শেষে পিঁপড়ে হয়ে গেল। গলার স্বর নেই, কান নেই, শুধু মুখে এক-জোড়া শক্ত চোয়াল। এদিকে ছ ছ'টি পা এবং কুচকুচে কালো শরীর। খোকনের খুব করে কান্না পেলে। কিন্তু কাঁদতে পারলে না সে।

পিঁপড়েরা বললে—এবার চল খোকন আমাদের রাণীর কাছে। খুব খুশি হবেন রাণী। খোকন আর কী করে? ছ'পায়ে পিল পিল করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলে পিঁপড়েদের পেছনে পেছনে।

উঠানে পা দিতেই একদল পিঁপড়ের সঙ্গে দেখা। তাদের চোয়ালঘষরে রকম সকম থেকে সাথী পিঁপড়েরা বলে উঠলে—খোকন, খোকন, তৈরি হয়ে পড়। ওরা আমাদের দলের নয়। এক্ষুণি হয়ত লড়াই করতে এগিয়ে আসবে।

খোকন জিজ্ঞাসা করলে—কেমন করে তৈরি হবো?

—পেছনের দিকটা চোয়ালে ঠেকাও। গল গল করে বেরিয়ে আসবে বিষাক্ত ফরমিক অ্যাসিড। আর আমাদের মত তুমিও তোমার গায়ের ড্যুফোর গ্রন্থি থেকে ফেরোমোন ছড়িয়ে বিপদ-সঙ্কেত পাঠাও। এক্ষুণি আমাদের দল এসে পড়বে।

একটু পরে আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলে খোকন, হাজার হাজার

পিঁপড়ে এসে যোগ দিলে তাদের সঙ্গে। আর ওদের দলও বেশ ভারি হয়ে উঠলে।

এবার শুরু হল লড়াই। এ ওর গলা কাটে তো, সে তার গলা কাটে। সে কী ভয়ানক লড়াই! মুহূর্তের ভেতরেই ওদের সবাই পড়ল কাটা। আর এদের দলের কয়েক হাজার প্রাণ হারালেও এরা হল জয়ী। যারা বেঁচে রইলে তারা সবাই হানা দিলে ওদের গর্তে। সৈনিকরা সব নিঃশেষ। যত ডিম, যত শূক, যত খাদ্য ছিল সবই বহে নিয়ে চললে নিজেদের গর্তে।

রাণী তখন ডিমপাড়ায় ব্যস্ত ছিল। লুঠ করা জিনিস দেখে খুব খুশি হলে। খোকনের সাথীদের মধ্যে একটি কাটা পড়লেও অপরটি বেঁচে ছিল। সে রাণীর সঙ্গে খোকনের আলাপ করিয়ে দিলে। বললে—আজকের লড়াইতে একা খোকন হাজার শত্রুর মাথা কেটেছে। যাকে বলে মস্ত এক বীর।

রাণী বললে—বটে, বটে! ওকে ভাল করে দুধ খাওয়াতে নিয়ে যাও। অবাক না হয়ে পারলেনা খোকন। সাথী কুটকুসকে জিজ্ঞাসা করলে—ভাই কুটকুস! তোমরা দুধ কোথা থেকে পাও?

হো হো করে হেসে উঠলে কুটকুস। হাসি থামিয়ে বললে—তুমি এখনও আমাদের অনেক খবর রপ্ত করনি দেখছি! তা যাক। ঐ মানুষ জাতটার কত বড়াই জানো? বলে কিনা, আমরা দুধ খেতে গাই পুষি! কিন্তু ওরা জানে না, ওদের আসার দশ কোটি বছর আগে থেকে আমরা পৃথিবীতে বাস করছি। ওরা চাষবাস আর গরু পোষা শুরু করেছে এই তো হাজার সাতেক বছর আগে। আমরা আমাদের গাই পুষে আসছি কোটি কোটি বছর আগে থেকে। মানুষদের গাই থেকে আমাদের গাইয়ের দুধ আরও মিষ্টি। এসো, দেরি করো না।

পিঁপড়েদের সঙ্গে এসে খোকন দেখলে, গাই বলতে একধরণের পেট-মোটা পোকা। দুধ খেতে হলে ওদের পেটটা আচ্ছা করে কামড়ে ধরতে হয়। আর তখনই গলগল করে ঝরে পড়ে মিষ্টি রস।

দলের সবাই দুধ খেতে ব্যস্ত হয়ে উঠলে। আর গান ধরলে—

দুধ খেতে পুষি গাই, চাষ করি অ্যালগি, আমরা খুদে পিঁপড়েরাই।
আওয়াজ শুনি না, কথাও যে বলি না, তবু সেরা জীব আমরাই।
থাকি না কাজ ছাড়া, দলবেঁধে হাঁটি মোরা, তবু কারও ঘাড়ে পড়ি না।
মিলেমিশে থাকি মোরা, দলের হয়ে লড়ি মোরা, মারামারি কখনও করি না।

হঠাৎ একসময় খোকন গায়ে কেমন যেন ঐক অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করলে। একেবারে চমকে উঠলে যেন। আর দেখলে, দলের সবাই গান থামিয়ে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। কুট্টুস তখনও ছিল কাছে। জিজ্ঞাসা করলে—কিছু টের পাচ্ছো কী ?

খোকন বললে—গায়ে কেমন যেন বার বার কাঁটা দিয়ে উঠছে।

—ঠিক তাই! এর লক্ষণ হচ্ছে, আগামী কয়েকদিনের ভেতরে হবে ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প বা এমনই একটা কিছু। জগতে একথা কেউ টের পায় না, কিন্তু আমরা পেয়ে যাই। খোকন জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে কী হবে ভাই! ভূমিকম্পে মাটি চাপা পড়বো, ঝড়ের মুখে উড়ে যাবো, নয়ত বানের জলে ডুবে মরবো ?

—না, সে ভয় নেই। দুর্যোগ আসতে দেরি আছে। ততদিনে আমরা সাবধান হয়ে পড়বো। বাসার সবাইকে নিয়ে আজ থেকে যাত্রা শুরু করবো কোন নিরাপদ জায়গায়। তুমি অবশ্যই মনে রাখবে, আমাদের এই অদ্ভুত ক্ষমতা থাকার জন্য এবং আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের বংশ দশ কোটি বছর ধরে টিকে আছে। তা না হলে অনেকের মত আমরাও কবে হারিয়ে যেতাম পৃথিবী থেকে।

ঠিক সেই সময় মা এসে ডাকলেন—খোকন, খোকন, উঠে পড় মাণিক আমার! গায়ে আর ব্যথা নেই তো ?

খোকন ফ্যালফ্যাল করে তাকালে মায়ের মুখের দিকে। তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলে। বললে—মা, আমি পিঁপড়ে হয়ে গেছি।

মা বললেন—বোকা ছেলে! মানুষ কী কখনও পিঁপড়ে হয়! তুই যেই খোকন, সেই খোকনই আছিস।

রাণী কাহিনী

সাত মহলা বাড়ীতে সহস্র সহস্র পরিচারিকা পরিবেষ্টিতা মক্ষীরাণী মৌমিতা অন্তঃপুরে আঁতুড় ঘরের দিকে চলেছে সন্তানের জন্মদানের উদ্দেশ্যে। ছকোনা ঈষৎ লম্বাটে ধরণের প্রকোষ্ঠগুলোকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালে রাণী। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে পরিচারিকাদের দিকে। পরিচারিকারা কিছু না বলে মৃদু হেসে গুণগুণ সুরে গান ধরলে—

উষা আর গোধূলিতে সবুজ সোনালী খেতে
তুমি শোননি কী, তুমি শোননি কী—জীবনের গান।
নতুন ও পুরাতন আগমন বর্জন
তুমি ভুলেছো কী, তুমি ভুলেছো কী—নিয়ম চিরন্তন।
হাসি আর উল্লাস ক্ষমতার অভিলাষ
এতো নহে জীবনের গান,
জাতির মঙ্গল স্মরি নবীনে বরণ করি
নিজেরেই দাও বলিদান।

গান শুনে আঁৎকে উঠলে রাণী। জীবনে এই প্রথম সে তাকালে তার সুন্দর দেহটার দিকে। সত্যই আগের জৌলস আর নেই। লোল গাত্রাবরণ, দৃষ্টি ঘোলাটে, সন্তান ধারণেও এসেছে অক্ষমতা। না, দলের নিয়মে বিদায় তাকে নিতেই হবে। ব্যতিক্রম হবার নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে রাণী উদাস দৃষ্টিতে একবার তাকালে আকাশপানে। মনের কোণে একে একে ভেসে উঠলো টুকরো টুকরো কত ছবি। সেই বসন্তপ্রভাতে সাত সাত কিশোরীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, তাদের একে একে পরাজিত করে রাণীর পদে আসীন

হওয়া, সেই তরুণদের অভ্যর্থনা এবং পরিচারিকাদের আনুগত্য, না—সেদিন আর ফিরে আসবে না।

পরের দিনগুলো আরও মধুময় করে তুলেছিল তরুণরা। মনে পড়ে, এক মধু পূর্ণিমার রাতে মধুজালক থেকে বেরিয়ে মধুকণ্ঠ তরুণদের সঙ্গে মধুদ্রুমের শাখায় শাখায় খেলেছিল লুকোচুরি খেলা। অবশেষে সেই তরুণরাই তাকে নেত্রীপদে অভিষিক্ত করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল সাত মহলা এই বাড়ীতে। সারা বাড়ীতে তখন বসেছিল রোশনচৌকি। নৃত্যে গানে একেবারে জমজমাট হয়ে উঠেছিল। তারপর পরিচারিকারা অভিবাদন জানাতে জানাতে নিয়ে গিয়েছিল রাণীর শূন্য মহলে। সেদিন যেন এক আত্মতৃপ্তির ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল তার সারা দেহমনে এবং জেগে উঠেছিল অহঙ্কারবোধ।

তারপর! তারপর শুধু সন্তানের জন্মদান। চাই কেবল কাজের লোক, আরও—আরও, শত শত—সহস্র সহস্র। রাণী নয়, পুরুষও নয়, দলের নির্দেশে যন্ত্রের মত কেবলই উৎপাদন করে গেছে কর্মীদের। সেই কর্মীরা আবার ক্রীতদাসের মত তার সেবা করেছে, দিনের পর দিন পাশে পাশে থেকে তার দেহের ঘ্রাণ নিয়েছে, নাচেগানে সন্তুষ্টি বিধান করেছে, পরিশেষে দলের জন্য আত্মঘাতীও হয়েছে কতজনে।

কিন্তু আজ! এতকাল ধরে যার নির্দেশকে দলের সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছে, নির্দেশমাত্র অকাতরে সহস্র সহস্র জনে দিয়েছে প্রাণ বিসর্জন, আজ তারাই প্রকারান্তরে হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী। জানিয়ে দিয়েছে, আর এখানে থাকা চলবে না তার। মানবে না প্রৌঢ়া রাণীর নির্দেশ। আশ্চর্য পৃথিবী!

পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট সেই প্রকোষ্ঠগুলোর দিকে। ভাবি তরুণদের জন্য অনিষিক্ত এবং ভাবী রাণীদের জন্য নিষিক্ত ডিম প্রসব করে বেরিয়ে এল অন্তঃপুর ছেড়ে। একবার ক্রূর হাসি হাসলে মনে মনে। রাণীর আসন অলঙ্কৃত করতে হলে একদিন ওদেরও দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। প্রকৃত বীরাঙ্গনাই লাভ করবে রাণীর পদ। ইতিহাসের ঘটবে পুনরাবৃত্তি।

অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করলে রাণী। এই প্রথম নিজেকে বড্ড একা একা মনে হলো তার। জীবনের প্রতি কেমন যেন ঘৃণা এলো। এতবড় গোছালো সংসার, নিজের জন্ম দেওয়া এবং নিজের হাতে গড়া এত অজস্র তার সন্তান সন্ততি—কেউ একটিবার তার দিকে ফিরে তাকালো না। তার মনে হলো, এত স্নেহ-প্রেম-প্রীতি সবই মিছে। এ কেবল বংশরক্ষার জৈবিক তাড়না এবং সে প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র।

আর অপেক্ষা করলে না রাণী। ধীর পায়ে প্রাসাদশীর্ষ থেকে অবতরণ করে নেমে এলে পথে। শেষবারের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সাতমহলা সেই বাড়ীটার দিকে। দেখলে, সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নতুন পুরুষ ও রাণীদের পরিচর্যা করতে। একটিবারও কেউ তাকাচ্ছে না তার দিকে। ধূসর দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে সামনে নিবদ্ধ করলে এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে।

এমন সময় এক বৃদ্ধা ধাত্রী এসে পথরোধ করে দাঁড়ালে। রাণী তাকে বললে—আর তো এখানে আমার থাকা চলেনা ধাত্রী!

ম্লান হেসে ধাত্রী বললে—না। তবে একা একা কেন যাবে রাণীমা! আমাদের ভেতরে যাদের দিন এসেছে ফুরিয়ে, যারা দলের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারাও সঙ্গিনী হবে তোমার।

—যাবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করলে রাণী।

—কোনরকমে ছোট্ট একটা কুড়ে বাঁধবো। তারপর অপেক্ষা করবো সেই শেষের দিনগুলোর জন্য। কিন্তু দুঃখ তুমি পাওনি তো?

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে রাণী বললে—না, দুঃখ কিসের! অনিবার্যকে বরণ করার মধ্যে দুঃখ কোথায়? তাছাড়া আমি তো অমর। কোটি কোটি বছর ধরে আমার সন্তানরা টিকিয়ে রাখবে আমার সত্তাকে। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে বল?

শেয়াল ও খরগোশ

ঊর্ণা নদীর তীরে হাজার হাজার বছরের পুরানো এক পাকুড়-গাছের তলায় গর্ত খুঁড়ে বাস করতো একদল খরগোশ। সাতপুরুষ ধরে তাদের মধ্যে ছিল বেজায় ভাব। তারপর বংশটা ভয়ানকভাবে বেড়ে যাওয়ায় আগের সদ্ভাব আর বজায় রইল না। প্রথমে অল্পে অল্পে খিটিমিটি, অবশেষে রাজ্যের যত হিংসা এসে চেপে বসলে তাদের মাথায়। এবার একজনের গর্তকে অপরে অধিকার করতে চাইলে, অপরের জমানো খাদ্যকে আত্মসাৎ করতে চাইলে, এমনকি নদীতীরের তৃণভূমিগুলিকেও গায়ের জোরে দখল করতে চাইলে।

বিষয়ের বিষে জর্জরিত হল সবাই। বিনা কারণে দিন দুবেলা শুরু হল ঝগড়া-বিবাদ, সামান্য কারণে খুনোখুনি-রক্তারক্তি, আর গায়ের ঝাল মেটাতে শত্রুকেও পথ দেখিয়ে আনালে।

দলে ছিল শ্বেতক নামে এক অতি বৃদ্ধ খরগোশ। দলের মনোভাব দেখে আঁৎকে উঠলে সে। শত্রু এসে কাউকে ঘায়েল করলে অন্যেরা যখন হাসাহাসি করতো, তখন বুকটা তার ব্যথায় টনটন করতো। যখন কারও খাবারকে অপরে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতো, তখন তার চোখদুটো জলে ভিজে যেতো। আর যখন দেখতো অসহায়রা খাদ্যের জন্য ধুঁকছে এবং বড়রা খাদ্যের গাদায় শুয়ে আছে, তখন বুকটা তার ফেটে চৌচির হয়ে যেতো। মনে মনে ভাবলে, হায়রে হায়। এমন একদিন ছিল—যেদিন সবাই একসাথে খাবার সংগ্রহ করে সমানভাবে ভাগ করে খেতো। একজন বিপদে পড়লে দলবেঁধে সবাই ছুটে আসতো, শত্রুর গন্ধ পেলে দলকে সাবধান করে দিত। কিন্তু আজ! সব যেন ওলোট-পালট হয়ে গেল!

শ্বেতক দলের সবাইকে অনেক করে বোঝালে, অনেক নীতিকথা

শোনালে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলে। শেষে যখন কিছুতেই তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হলনা তখন শ্বেতক অন্য কথা চিন্তা করলে। তার কেবলই মনে হতে লাগলো এইভাবে হানাহানি চলতে থাকলে, শত্রুদের আক্রমণ অব্যাহত থাকলে, বংশটা নির্মূল হতে খুব বেশী দেরি হবেনা। কিন্তু কেমন করে বংশনাশ রোধ করবে সে?

অনেক ভেবে, অনেক চিন্তা করে শ্বেতক একদিন এক ভূঁড়ো-শেয়ালের কাছে হাজির হলে। এমনই ভান করলে—যেন সে হঠাৎই শেয়ালের সামনে এসে পড়েছে। শেয়াল তার থাবা দিয়ে চেপে ধরতেই কাঁপতে কাঁপতে শ্বেতক বললে—দোহাই শেয়াল দাদা, আমাকে মেরোনা। আমি তোমাকে অনেক-অনেক খাবারের সন্ধান দেবো। সারা বছর খেয়েও শেষ করতে পারবেনা।

শেয়াল ভেবে দেখলে কথাটা। আগের আগের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলে, ওটাকে টিকিয়ে রাখলে ওর বংশের সবাইকে একে একে ঘায়েল করা যাবে। শেষে বংশে যখন বাতি দিতে কেউ থাকবেনা তখন ওকেই দিয়ে শেষ জলযোগটা সেরে ফেলা যাবে—ভূরিভোজের পর মুখশুদ্ধির মতই হবে।

শেয়াল খুশি হওয়ার ভান করে বললে—চল, চল! দেখি কোথায় কত খাদ্য মজুত আছে!

শ্বেতক তখন শেয়ালকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই পাকুড়গাছের তলায়। একটু দূরে ছিল ঘন একটা ঝোপ। ঝোপের তলায় লুকিয়ে থেকে শ্বেতক বললে—এইখানে একটু অপেক্ষা কর শেয়াল দাদা! দেখবে দলে দলে তোমারই কাছে ছুটে আসবে।

শ্বেতকের কথা শেষ হতে না হতেই একদল খরগোশ ঝগড়া করতে করতে বেরিয়ে এলে গর্ত থেকে। তারপর ছুটতে ছুটতে এবং চেঁচামেচি করতে করতে একেবারে পড়বি তো পড় শেয়ালের মুখেই।

সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলে শেয়াল। দুটিকে দুটো থাবায় আটকে রেখে বেশ রসিয়ে রসিয়ে কুড়মুড় করে চিবুতে লাগলে। শ্বেতক বললে—কেমন দাদা, ঠিক বলেছিলাম কিনা!

শেয়াল খেতে খেতে একবার জুল জুল করে তাকালে তার দিকে। মুখ ভর্তি থাকায় প্রথমে কথা বলতে পারলে না। ঢোঁক গিলে হাসি হাসি মুখে বললে—আমি জানতাম তোমার কথা বেঠিক হওয়ার নয়। তবে এমন সহজে এত খাদ্যের নাগাল যে পাওয়া যাবে –তা ভাবিনি। সত্যিই তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়।

এদিকে বৃহৎ শত্রুর হাতে দুটো খরগোশ যে মারা পড়েছে সে খেয়াল কারও নেই। অবশিষ্টরা একটু দূরে গিয়ে তখনও ঝগড়া করছিল এবং গর্ত থেকে আরও কয়েকটা দল বেরিয়ে এসে শুরু করে দিয়েছিল মারামারি। শেয়াল লাফ দিয়ে আরও কয়েকটার ঘাড় মটকে ফেললে এবং ঝোপের ভেতরে ভূরি ভোজের পরে নাক ডাকাতে শুরু করলে।

দিন যায়। শেয়ালটা অতি অল্পায়াসে শিকার ধরে খায় আর পড়ে পড়ে কেবলই ঘুমায়। যে খেঁকশিয়ালরা ধারে পাশে বসতি গড়ে তুলেছিল তাদের তাড়িয়ে দিলে ভূঁড়ো শেয়ালটা। নতুন কোন হানাদার এসে যাতে ভাগ বসাতে না পারে তার জন্যও সজাগ হয়ে রইলে।

দেখতে দেখতে একমাসেই নিঃশেষ হয়ে গেল অর্ধেকের বেশী খরগোশ। নিয়ম অনুযায়ী জমির দখলদারদের বাহিরে এসে জমি তদারকি করতে হতো এবং দশ জনের সঙ্গে ঝগড়া করতে হতো বলে তাদের একটিও কেউ রইল না। মজুতদারদের মজুত খাদ্যে টান পড়ায় বাধ্য হয়ে বাহিরে এসে শেয়ালের হাতে মারা পড়তে হলো। যারা কৌশলে অপরকে ফাঁকি দিয়ে খাদ্য আত্মসাৎ করতো তারাও আনাড়ির মত খাদ্য খুঁজতে এসে প্রাণ হারাল। টিকে রইল তাদেরই কয়েকজন—যারা দিনে রাতে, রোদে-জলে শীতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে খাদ্য সংগ্রহ করতো, যারা প্রথম থেকে শুকনো খড়-কুটাকেও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আর যারা দৌড়ঝাঁপ দিয়ে শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

ভূঁড়ো শেয়ালটারও এবার খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিল। সহজে প্রচুর সুখাদ্য লাভ করায় তার গায়ের জৌলুস যেমন খু'ল গিয়েছিল, তেমনই ভূঁড়িটাও তিনগুণ বেড়ে উঠেছিল। এতবড় পেটটাকে নিয়ে

সে সহজে আর চলাফেরাও করতে পারে না। শত্রুর ভয়ে ঝগড়া বিবাদ বন্ধ হওয়ায় এবং সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলাফেরা করায় শেয়ালের নাগালের বড় একটা কেউ আসে না।

শ্বেতকের মনের বাসনাও পূর্ণ হল এতদিনে। কিন্তু তার দলের এতজনে মারা যাওয়ায় বিমর্ষও হয়ে পড়লো অনেকখানি। একদিন পূর্ণিমার রাতে দলের যে কয়েকজন অবশিষ্ট ছিল তাদের সবাইকে জড় করে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললে—ভাইসব! আমরা আকাশের ঐ চন্দ্রেরই বংশধর। আমাদের মধ্যে সদ্ভাব নষ্ট হওয়ায় চন্দ্র নিজেই রেগে শত্রু শেয়ালকে পাঠিয়ে বংশকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এবার তিনি নিজেই দুঃখিত। তাই গতকাল রাতে তিনি আমাকে স্বপ্নে বলে গেলেন, তুমি দলের অবশিষ্টদের নিয়ে ঐ শেয়ালটার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি তোমাদের সাহায্য করবো।

আঁৎকে উঠলে খরগোশেরা। বললে—আমরা এই এত্তটুকুরা কেমন করে যুদ্ধ করবো বিরাট ঐ শেয়ালটার সঙ্গে। আমাদের জীবনীশক্তিও যে বড় ক্ষীণ। সামান্য আঘাতে এমনকি উচ্চ শব্দেও আমাদের জীবনহানি ঘটে।

শ্বেতক মৃদু হেসে বললে—চন্দ্রদেবকে আমি সে কথা বলেছিলাম। তাতে তিনি কী বলেছেন জানো?

—কী বলেছেন? গভীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে খরগোশেরা।

—বলেছেন, এইভাবে ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে একদিন তোমাদের সবাইকে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে। বংশে একটিও কেউ থাকবে না। যুদ্ধে গিয়ে তোমরা দু-দশটা হয়ত মরবে ঠিকই তবে বিরাট ঐ শত্রুটা ঘায়েল হবে। তাতে অনেকেই টিকে যাবে এবং তোমাদের ছেলে-পুলেরাও টিকে থাকবে। তিনি আরও বলেছেন, ক্ষুদ্র হলেও কেউ ফেলনা নয়। সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র এক জায়গায় থাকলে শেয়ালতো ছার বনের বাঘকেও হার মানতে হয়।

খরগোশেরা চুপ করে রইলে। শ্বেতক পুনরায় বললে—শেয়ালটা এখন ঘুমোচ্ছে। এসো, চন্দ্রদেবকে স্মরণ করে আমরা সবাই একসঙ্গে

তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ি। চোখের পলকে সহস্র সহস্র ধারালো নখের আঘাতে শেষ করেছি। যে নখের আঘাতে পাথরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি সেই নখের আঘাতে একটা পশুর চামড়াকে ফালা ফালা করে দিতে পারবো না!

খরগোশরা বললে—নিশ্চয়ই পারবো। তবে সামনে কে থাকবে আমাদের! শ্বেতক গম্ভীর গলায় বললে—তার জন্য তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। আমি বুড়ো হয়েছি। আজ নয় কাল এমনিতেই মরতে হবে। তার চেয়ে এই মহৎ কাজে আমিই আগে জীবন দান করবো।

সম্মত হল খরগোশেরা। শেয়ালের কাছাকাছি হতে শ্বেতক তাদের বললে—আমি শেয়ালের এক্কেবারে মুখের কাছে থাকবো আর তোমরা ওর পেছনে। যখনই আমি ওর মুখে একটা আঁচড় কেটে দেবো তখনই তোমরা একশজন লাফিয়ে পড়বে তার উপর এবং বিদ্যুৎগতিতে চালাবে নখের কাজ।

শ্বেতকের নখের আঘাতে জেগে উঠলে শেয়াল। আর তক্ষুণি মাথায় বুকে ও পেটে তীব্র জ্বালা ধরে গেল। শেয়াল মুখের কাছে কেবল শ্বেতককে পেয়ে তারই ঘাড়টা ধরে নিলে। বললে—আজ এতদিন পরে তুমি কী মনে করে এসেছো!

শ্বেতক বললে—জ্ঞাতিনাশের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

ততক্ষণে শেয়ালের পিঠটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। বন্ধ মুখটা খুলতে খুলতেই আরও অজস্র আঁচড় বসে গেল চোখে, মুখে, কানে ও পেটে। ছুটে পালাতে চাইলে সে। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলে না। একটু গিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এদিকে নিষ্পন্দ হয়ে গেল শ্বেতকের শরীরটাও।

শেয়াল পণ্ডিত

মধুমতী নামে ছিল এক নদী, তার তীরে ছিল নিবিড় এক বন। সেই বনে অশোক পলাশরা রঙ ঝরাতো, মহুয়া-বকুল-পারুলরা বাতাসে মিঠে মিঠে সুবাস ছড়াতো, আর শাল-পিয়াল-দেবদারুদের পাতার খস্‌খস্ মর্‌মর্ শব্দে সারা বনভূমি সবসময় যেন উতলা হয়ে থাকতো।

পশুপাখীতেও একেবারে ভরপুর ছিল সেই বন। পাতার ফাঁকে ফাঁকে গান গেয়ে বেড়াতো দোয়েল, কোয়েল, ফিঙে ও বুলবুল-; নদীর তীরে তীরে পালে পালে ঘুরে বেড়াতো হরিণ; ঝোপে-ঝাড়ে মুখটি গুঁজে চুপটি করে পড়ে থাকতো ডোরাকাটা বাঘ; আর বুড়ো পাকুড়-গাছটার তলায় হাজার হাজার গর্তে বাস করতো রাজ্যের যত খরগোশ, বনবেড়াল, খেঁকশিয়াল ও ভূঁড়োশেয়াল।

সবার বড় গর্তটিতে শেয়ালপণ্ডিতের বাসা। এই শেয়াল—সেই কুমীরছানাখেকো চতুর শেয়াল নয়, বাঘরাজার তাঁবেদার সেই লোভী শেয়াল নয়, কিংবা সিংহমামার অনুচর সেই ধূর্ত শেয়ালও নয়। দস্তুরমত ভাল লোক। মাছ-মাংসের ধার ধারেনা, সকালে বিকেলে পোড়োদের পড়ায় এবং দিনশেষে দিবাকর যখন ওপারে বনের মাথায় পোঁচের পর পোঁচ লাল রঙ লাগাতে থাকে তখনই ছুটে যায় মধুমতীর তীরে—যেখানে অশোক ও পলাশ গাছদুটো হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তারই তলায়।

সুয্যিমামা একসময় রাঙা মেঘের রথে আরোহণ করে ডুব দেয়, পানকৌড়িরা মধুমতীর জলে ডুবে আর উঠে, বুনো হাঁসের দল গুগলি তুলে খায়, গাঙ শালিকরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়,—ভারি ভাল লাগে শেয়ালের। সে উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকে এবং কবিতার পর কবিতা লিখে যায়। অবশেষে পাখীদের চিৎকার ও চেঁচামিচিতে মুক

বনভূমি মুখর হয়ে উঠলে, জোনাকিরা গাছের মগডালে মগডালে দলা পাকাতে শুরু করলে এবং ঝিল্লীরা এক নাগাড়ে বনের বন্দনাগান জুড়ে দিলে, ধীরপায়ে এগিয়ে যায় বাসার দিকে।

পণ্ডিত কারও সাতেও থাকেনা, পাঁচেও থাকে না। ঝগড়াঝাটি, মারপিট—তাও করেনা। অথচ ছোট-বড় যে কেউ বিপদে পড়লে সেই-ই ছুটে যায় সবার আগে। শুধু কী তাই? বনের সবার ছানাপোনাকে মানুষও করে সে। তাই তো সবাই তাকে ডাকে বনের পণ্ডিত বলে।

পণ্ডিতকে ভালওবাসে সবাই। বিশেষ করে সেই যে—যেবার মাঝরাতে হঠাৎ বনে বনে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল, সেবার এই পণ্ডিতই বুদ্ধি করে অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল বলে খাতিরটা আরও বেড়ে গেছে। এখনও বড়রা ছোটদের বলে, এই সেই পণ্ডিত—যে নিজের জীবনের পরোয়া না করে পরের ছেলেদের আগুনের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিল। মায়ের মমতা দিয়ে সেবা করেছিল আহতদের, পিতার স্নেহ দিয়ে পালন করেছিল অনাথদের, অতএব পেন্নাম কর ওকে।

সেদিনটা ছিল বড় ভ্যাপসা গরম। নদীতীরে হিমেল হাওয়ায় শরীরটাকে একটু জুড়িয়ে নিতে পণ্ডিত একটু সকাল সকাল এসে বসেছিল সেই অশোক ও পলাশের তলায়—একটা পাথরের চাঁইর উপর। তন্ময় হয়ে দেখছিল বাঁকের মুখে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা গভীর তপস্যায়রত বকবাবাজীদের এবং ছানা-পোনাদের সঙ্গে কুমীর মাসিকে মড়ার মত ভেসে থাকতে। অকস্মাৎ নাকে বোটকা বোটকা গন্ধ এসে লাগায় মুখ ফেরালে পণ্ডিত। দেখলে, বাঘমামা দিবানিদ্রা সাঙ্গ করে ধীর পায়ে হেলতে দুলতে এবং হাই তুলতে তুলতে এগিয়ে যাচ্ছে অদূরে কাশবনের দিকে।

এক সময় পণ্ডিতকে দেখে থমকে দাঁড়ালে বাঘমামা। পণ্ডিত তখন আর কী করে! বাধ্য হয়ে সামনের দুপায়ের থাবা দুটোকে এক করে বললে—পেন্‌নাম মামা।

মৃদু মৃদু হাসলে মামা। বললে—কবে থেকে তোমাকে একটা কথা

বলবো বলবো বলে ভাবছি ভাগনে! তবে সময়ের এমন টানাটানি যে, কিছুতেই বলা হয়ে ওঠেনি। তা ভাগ্‌নে, শরীর তোমার ভাল তো? পণ্ডিত দায়সারা গোছের উত্তর দিলে—একরকম আছি, এই আর কী! বাঘ বললে—যাক্, ভাল থাকলেই ভাল। যা গরমখানা পড়েছে! আগের মতই নিতান্ত নিরাসক্ত গলায় বললে পণ্ডিত—তা যা বলেছেন মামা!

ঠিক সেই সময় অদূরে ঝোপটার পাশ দিয়ে কয়েকটা চিতল হরিণ ছুটে বেরিয়ে গেলে। বাঘমামার বুড়ো আঙুলের মত মোটা গোঁফের লোমগুলো বার দুই কেঁপে উঠলে থরথর করে। এদিকে ওদিকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে বাঘ মামা বললে—হাঁ, যা বলছিলাম! আমার ছেলেটা দিনদিন বড় বখাটে হয়ে উঠছে, বয়সও বড় কম হল না তার। তুমি দিন সাতেক ওকে একটু কাছে রেখে পড়াও দেখি, যদি মানুষ-টানুষ হয়।

গোঁয়ার গোবিন্দ ও গোস্‌তখোর বাঘের গোস্তাকিকে পণ্ডিত কক্ষনো বরদাস্ত করতে পারেনি। তবু সরাসরি সে নাও বলতে পারলে না। মুখটা কাচুমাচু করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললে—আমরা বড্ড গরীব মামা! দুবেলা দুমুঠো পেট পুরে খেতেও পাই না। ভাই আমার রাজার ছেলে, সে কী খাওয়ার অভাব সইতে পারবে?

—খাওয়ার ভাবনা ভাবতে হবেনা তোমায়। দৈনিক সকালে তোমার বাসায় কিছু কিছু কচি হরিণের মাংস পাঠিয়ে দেবো। তুমিও খেয়ো পেটপুরে। বাঘের ভাগনে হয়ে নিরামিষ খাও—বেজায় ঘেন্নার কথা।

শেয়াল দেখলে, ভারি বিপদ। তখন অন্য সুর ধরলে সে। বললে—মামাগো, মাটির ঘরে বাস করার দুঃখ অনেক। গরমের দিনে বাতাস পাইনা একটুও। আকাশের জল মাটিতে পড়তে না পড়তে মেঝেতে বান ডেকে যায়। আর শীতের দিনে দিনদুপুরেও দাঁতকপাটি লাগে। পাথরের ঘরে বাস তোমাদের, ভাবতে পারবে না মাটির ঘরের দুঃখ।

শিয়ালের কথায় একেবারে আমল দিলেনা বাঘ। বললে—ওসব

ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। দু-দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া লেখাপড়া শিখতে গেলে দুঃখু একটু পোহাতে হবে বৈকি!

বাঘমামা আর দেরি করলেনা। হন হন করে এগিয়ে গেলে নদীর চরের দিকে। যেতে যেতে বললে—কাল সকালেই ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেবো। মনে রাখবে, সময় মোটে সাতদিন। ঐ সাতদিনেই রাজার মত বিদ্যে তাকে দান করবে।

বাঘ চলে যাওয়ার পর শেয়াল গোঁজ হয়ে বসে রইলে কিছুক্ষণ। তারপর মুখটাকে হাঁড়ির মত করে ফিরে এলে বাসায়। শেয়ালগিন্নী তখন পালকের ঝাঁটা দিয়ে ঘর দোর ঝাড়ছিল। অসময়ে শেয়ালকে ফিরতে দেখে অবাক বড় কম হলে না। শুধোলে—আজ বড় সকাল সকাল ফিরে এলে যে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সব কথা খুলে বললে শেয়াল। শুনে শেয়ালগিন্নীতো একেবারে মুখিয়ে উঠলে। বললে—গুরুগিরি করতে করতে তোমার মাথাটা গাধারও অধম হয়ে গেছে। জানো, রাজার ছেলেকে পড়ালে কতখানি খাতির বাড়বে তোমার? তারপর এই ছেলেটা যখন রাজা হবে তখন তুমিই হবে রাজগুরু। এ কী চাট্টিখানি কথা!

শেয়াল আর ভরসা পেলেনা কিছু বলতে। আগের মতই গোঁজ হয়ে বসে রইলে। এবার গলা ছেড়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতে শুরু করলে শেয়ালগিন্নী—হায়রে আমার পোড়া কপাল! শাকপাতা চিবুতে চিবুতে পেটের বারটা বেজে গেল। তবু একদিনও যদি একটু হরিণের মাংস পেতাম।

শেয়াল দেখলে, তার মনের কথা কেউ বুঝবে না। তাই কথা না বাড়িয়ে নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলে চুপচাপ।

পরদিন সকালে বাঘমামা নিজেই হাজির হলে সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে। ঘাড়ে তার মাঝারি ধরণের চমৎকার একটা হরিণ। হরিণটার গলায় জবাফুলের মত লাল লাল ছোপ তখনও ফুটে রয়েছে।

শেয়ালগিন্নী হরিণ দেখে খুব খুশি হলে। বাঘকে খাতির করে

বসিয়ে খুব তারিফ করলে তার। অবশেষে জুড়ে দিলে গল্প। আর শেয়াল ভাল করে একবার তাকালে বাঘের ছেলের দিকে। দেখলে, বয়স বেশ হয়েছে। চেহারাটাও তাগড়া। এ বয়সে ওকে ধরে বসে লেখাপড়া শেখাতে গেলে কিছুটি যে হবেনা, তা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলে পণ্ডিত। জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কী ভাই ?

বাঘের ছেলে বুক ফুলিয়ে বললে—আমার নাম পাটল।

পণ্ডিত তার কথা বলার ধরণ দেখে হাসলে মৃদু মৃদু। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে—ভাই পাটল, তুমি বসে বসে লেখাপড়া শিখতে পারবে তো ?

মুখটা কাচুমাচু করে পাটল বললে—জানেন গুরুমশাই, চুপচাপ থাকতে আমার একদম ভাল লাগেনা।

পণ্ডিত কী যেন ভাবলে মনে মনে। তারপর মৃদু গলায় বললে—বুঝলে ভাই পাটল, সাত সমুদ্দুরের মত সাত সাতখানা শাস্তর। আর সময় মোটে সাতটে দিন। ঐ সাতদিনের ভেতরেই তোমাকে সবকিছু পড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু রাজার ছেলে তুমি, শরীরের এত ধকল সইতে পারবেনা। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। সাতদিনে সাতটে বন ঘুরিয়ে আনবো তোমাকে। আর গপ্‌পোও বলবো। মানুষ হতে চাইলে আশা করি ওতেই হবে।

খুব খুশি হলে পাটল। বললে—সেই-ই ভাল গুরুমশাই! বেড়াতে আমার ভারি ভালো লাগে আর ভাল লাগে গপপো শুনতে। চলুন এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাক।

* * *

কত খাল-বিল পার হয়ে, কত নদীনালা সাঁতার কেটে, সাতদিনে সাত সাতটে বন হয়ে পণ্ডিতের সঙ্গে পাটল যখন নিজের বনে ফিরে এলে তখন বাঘমামা শেয়ালের বাসার সামনে বসে রাগে গর গর করছে আর ঘন ঘন লেজ আছড়াচ্ছে। ছেলেকে দেখে এবার যেন ধড়ে প্রাণ এল তার। ছুটে গিয়ে পাটলকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে—

হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় গিয়েছিলে তোমরা! যা ভাবনায় ফেলেছিলে ?

হাসি হাসি মুখে পাটল বললে—সাতদিনে সাতটে বন ঘুরলাম, দুটো বন জয় করে তোমার রাজ্যকে বাড়িয়ে এলাম, আর এইমাত্র দুটো কেঁদো বাঘকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে বেত্রবতী বনটাকে শত্রুমুক্ত করে এলাম।

পাটলের কথা শুনে বাঘমামা বেজায় খুশি হলে। এবার পণ্ডিতকে বুকে নিয়ে বললে—ধন্য ভাগনে, ধন্য তোমার বিদ্যে! একটা দুধের ছেলেকে নিয়ে যে কাজ করে এলে, তা কোনদিনই এ বন ভুলবে না তোমাকে!

পাটল বললে—সত্যি বাবা, দাদার যা বুদ্ধি! তারিফ করার মত।

খুশিতে ডগমগ হয়ে বাঘ বললে—হবে না! কার ভাগনে দেখতে হবে তো! তা যাক, আজ থেকে ভাগনেকে আমার মন্ত্রী করে নিলাম।

শেয়াল কিন্তু রাজি হলে না। অনুনয়ের সুরে বললে—দোহাই মামা, এতবড় পদে আমি একেবারেই বেমানান। যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমাকে ছেলে পড়াতে দাও আর দাও কবিতা লিখতে।

বাঘ মৃদু হেসে বললে—ভাগনে, তোমার বিদ্যের কোন তুলনা হয় না সত্য কিন্তু মগজে ঘিলু নেই এক ফোঁটাও। যদি বা ছিল ছেলে ঠেঙাতে ঠেঙাতে সবই গেছে। তা না হলে পাটলের অধিকার করা দুটো বনের অন্ততঃ একটাকে হাতে রেখে রাজা হতে পারতে!

ছেলের দিকে তাকিয়ে বাঘ পুনরায় বললে—তুমি আজ লেখাপড়া শেষ করে বাড়ী ফিরলে, একটা মনের মত ভোজের আয়োজন না করলে নয়। ভাগনেকে নিয়ে ঘরে যাও, আর আমি যাই শিকারের খোঁজে।

অজস্র কাশঝাড়ে ঢাকা মধুমতীর বাঁকের দিকে এগিয়ে গেলে বাঘ মামা। পণ্ডিত কিন্তু পাটলের সঙ্গে গেলে না। সে তার সেই প্রিয় অশোক ও পলাশ তলায় গিয়ে পাথরের চাঁইটার উপর বসলে। চেষ্টা করলে একটা কবিতা লিখতে।

কিন্তু না, আজ কলমের ডগায় কিছুতেই কবিতা এলে না। পাটলের জন্য মনটা কেবল আকুলি ব্যাকুলি হতে লাগলে। সাত সাতটে দিন সে ঘুরেছে সাথে সাথে, আজ ছাড়াছাড়ি হওয়ায় মনটা কেবল ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগলে। তাই এমন এক সুন্দর জোছনা রাতে তার মনে রঙ ধরাতে পারলে না, গলিত রূপার মত নদীর জলরাশি তার মনকে গলাতে পারলে না, আর মধুমতীর কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে কোন গানও ভেসে এলে না তার কানে। কেবলই ঘুরে ফিরে আসতে লাগলে পাটলের কথা। বুকটাও কেমন থেকে থেকে মোচড় দিতে শুরু করলে।

একসময় একটা গোঙানির শব্দ কানে আসতে ভাবনায় ছেদ পড়লে শেয়ালের। দেখলে, দূরে—মধুমতীর সেই বাঁকের মুখে বাঘমামা রেগে মেগে একটা কুমীর ছানাকে আঁচড়ে কামড়ে একেবারে মেরে ফেলার জোগাড় করেছে। আর কুমীর ছানার বীভৎস চিৎকারে সারা বনটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

শেয়াল আর চুপটি করে বসে থাকতে পারলে না। ছুটে গেলে বাঘের কাছেই। অনুনয়ের সুরে বললে—হতভাগাকে ছেড়ে দাও মামা! অতি হীন ও নগন্য এক জীবকে মেরে ফেলে তোমার হাতকে কলঙ্কিত করোনা।

বাঘ ফোঁস ফোঁস করতে করতে বললে—ওর দুঃসাহসখানা দেখেছো ভাগনে! পুঁচকে এই কুমীরছানাটা রোজ রোজ আমার মাছ শিকারের সময় বাধা হয়ে দাঁড়াতো। আজ দিয়েছি ব্যাটার ভবলীলা সাঙ্গ করে।

শেয়াল দেখলে, সত্য সত্যই কুমীরছানার দেহটা একেবারে নিথর হয়ে গেছে। কেবল মুখটা মাঝে মাঝে একটু হাঁ করছে আর বন্ধ করছে। ভারি গলায় শেয়াল বললে—কাজটা বড় ভাল করলে না মামা। কুমীর জাতটাকে আমার বেজায় ভয় করে। গোঁয়ারের একশেষ, বুদ্ধিও নেই ঘটে। ওর মা কখন যে কী করে বসবে!

হঠাৎ রেগে উঠলে বাঘমামা। বললে—তুমি আমায় শেয়াল পেয়েছো যে, কুমীরের ভয়ে আমি মাটির ভেতরে সেঁধিয়ে যাবো? আমি

বাঘ, বনের রাজা! অমন দশটা কুমীরকে লেজে বেঁধে ঘোরাতে পারি।

অতি ধীর ও সংযত গলায় শেয়াল বললে—আমি জানি মামা, তোমার গায়ে জোর আছে। তবু সাবধানের মার নেই। মা কুমীরটা হয়ত কাছে পিঠে কোথাও আছে। জলের কিনারা থেকে একটু দূরে সরে এসে দাঁড়াও। তা না হলে একটা অঘটনও ঘটে যেতে পারে।

বাঘ কটমট করে তাকালে শেয়ালের দিকে। তারপর রাগে গরগর করতে করতে বললে—তুমি নেহাতই বনের পণ্ডিত, তার উপর আমার ছেলেকে পড়িয়েছো এবং দু-দুটি রাজ্য জয় করতেও সাহায্য করেছো। তা নাহলে বাঘের সঙ্গে তর্ক করার সাহস হাতে নাতেই দেখিয়ে দিতাম।

শেয়াল আর কিছুটি বললে না। বাঘমামা তার দিকে বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে আরও জলের কিনারায় এগিয়ে গেলে এবং লেজটাকে আছড়াতে লাগলে। বললে—বাঘের ভাগনা হয়ে তুমি যে এতটা কাপুরুষ, তা কখনও ভাবিনি। এই ছ্যাখো, জলের কাছেই বসেছি। দেখি তোমার কুমীর কী করতে পারে?

শেয়াল এবারও বাঘের কথার কোন জবাব দিলেনা। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটা ভাঙ্গা শাঁখে করে নদী থেকে জল এনে ছানাটার মুখে দিলে এবং নিজের লোমশ লেজটাকে নেড়ে নেড়ে বাতাস করতে লাগলে।

সহসা একটা হুটোপুটির শব্দ শুনে মুখ ফেরালে পণ্ডিত। যা দেখলে, তাতে তার গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। কখন মা কুমীরটা এসে বাঘমামাকে টেনে নিয়ে গেছে মাঝ-নদীতে। খুবলে খুবলে এক এক ঝুড়ি করে মাংস খসিয়ে আনছে কুমীর আর লালে লাল হয়ে উঠেছে নদীর জল। পণ্ডিত হাঁ করে তাকিয়ে রইলে সেইদিকে।

কতক্ষণ পরে মা কুমীরটা ডাঙায় উঠে এলে। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে—শেয়ালভাই, আমি শুনেছি আমার ছেলের

জন্য তোমাকে বাঘের সঙ্গে তর্ক করতে। শেষ সময়ে তুমি আমার ছেলের মুখে জল দিয়েছো, হাওয়া করেছো, বাঁচাবার চেষ্টাও করেছো। তোমার ঋণ জীবনে আমি শুধতে পারবো না।

শেয়াল বললে—আমার কর্তব্যটুকু করেছি মাত্র, পারিনি তোমার ছেলেকে বাঁচাতে। তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা যদিও আমি খুঁজে পাচ্ছিনা তবু অনুরোধ করছি, তোমার অপর ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে মরা ছেলেটার শোক ভুলতে চেষ্টা কর।

বড় বিষাদের হাসি হাসলে কুমীর। বললে—শেয়াল ভাই, তোমরা বুঝবেনা মায়ের মন। একশ ছেলের মাও ভুলতে পারেনা একটিমাত্র ছেলে হারানোর ব্যথাকে। তাই বলে শোধ না নিয়ে আমি ছাড়ছিনা। যেমন করে হোক ঐ বাঘের বংশটাকে আমি লোপ করে দেবোই। যাবে কোথায়! শিকার না পেলে ওদের মাছ ধরতে নদীতে নামতে হবেই।

চিৎকার করে উঠলে শেয়াল। বললে—না, না বোন, একের অপরাধে অপরকে অপরাধী করোনা।

শেয়ালের কথায় কর্ণপাতও করলে না কুমীর। মরা ছেলেটাকে পিঠের উপর ফেলে ধীর পায়ে নেমে গেলো নদীর জলে।

পরদিন বিকেলে শেয়াল আবার এসে বসলে সেই অশোক ও পলাশ-গাছের ছায়ায়। আজও পাটলের কথা তার বারবার মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল কতকালের দুর্ঘটনার কথা। হঠাৎ পাটলকে গোমড়ামুখে নদীর দিকে আসতে দেখে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল তার।

শেয়ালের মনে কেমন যেন খটকা লাগলে। সে ভাল করেই জানতো ঐ বাঘের জাতটাকে। শোধ তুলতে ওদের জুড়ি নেই। তাই দূর থেকে লক্ষ্য করলে পাটলের গতিবিধিকে।

শেয়াল যা ভেবেছিল, শেষে তাই-ই হলো। পাটল রাগে গরগর করতে করতে একেবারে জলের কিনারায় এসে লেজ আছড়াতে শুরু করলে। শেয়াল আর একটুও দেরি করলেনা। ছুটে গেল সোজা

পাটলের কাছে। জিজ্ঞাসা করলে—তুমি অমন রাগে গরগর করছো কেন পাটল ?

হাঁড়ির মত মুখটাকে আরও হাঁড়ি করে পাটল বললে—জলের কুমীর আমার বাপকে মেরেছে। আমি তার বদলা নেবো।

মৃদু হেসে শেয়াল বললে—কুমীর জলের জীব আর তুমি হচ্ছো ডাঙার। পারবেনা তার সঙ্গে এঁটে উঠতে। অতএব পালিয়ে এসো জলের কিনারা থেকে। যদি কখনও ডাঙায় তাকে দেখতে পাও তাহলে তখনই বদলা নিতে চেষ্টা করো !

—আপনি কী আমাকে কাপুরুষ হতে বলছেন ? জিজ্ঞাসা করলে পাটল। শেয়াল দৃঢ়স্বরে বললে—না ! কাপুরুষকে আমি বরাবরই ঘৃণা করি। তাই বলে যারা অবিবেচক তাদেরও আমি সহ্য করি না। ডাঙার জীব তুমি, খবর রাখোনা জলে কুমীরের তেজ কতখানি !

পাটল কিচ্ছু বললে না। কেবল গোঁজ হয়ে বসে রইলে। ঠিক সেই সময় মাঝনদীতে একজোড়া ড্যাবডেবে চোখকে হঠাৎ জেগে উঠতে দেখে চিৎকার করে উঠলে শেয়াল। বললে—ওরে পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয় ! কুমীর টের পেয়ে গেছে তোর উপস্থিতি।

শেয়ালের মুখের কথা শেষ হল না। লেজের একটা ঝাপটা খেয়ে পাটল ছিটকে পড়লে একেবারে জলে। উপায় না দেখে তখন শেয়ালও ঝাঁপ দিলে জলে। পাটলের পাশে সাঁতার কাটতে কাটতে বললে—কুমীর, বোন আমার ! তুমি ভুল করে বাঘের ছেলের বদলে আমার পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছো। আর আমারই পিঠের উপর বাঘের ছেলেটা আরামে বসে আছে। আমার পা-টা ছেড়ে দাও বোন !

কুমীর ভাবলে, বুঝিবা তার ভুল হয়েছে। তাই বাঘের ছেলের পা ছেড়ে দিয়ে শেয়ালের পা ধরেই টানতে শুরু করলে।

এদিকে কুমীরের লেজের ঝাপটা খেয়ে এবং বারকয়েক জলে চুবুনি খেয়ে পাটলের বীরত্বটা একেবারে ধোঁয়ার মত উড়ে গিয়েছিল।

ছাড়া পেয়েই কোনও রকমে সাঁতরে তীরে এসে ভিড়লে এবং কুমীরের আওতা থেকে অনেক দূরে গিয়ে বসলে।

কুমীর মাঝনদীতে শেয়ালকে ভাসিয়ে যখন তার পেট থেকে এক খাবল মাংস খুলে নিলে তখনই সে তার ভুল বুঝতে পারলে। হায় হায় করে উঠলে সে। তারপর একটুও দেরি না করে শেয়ালকে পিঠে নিয়ে উঠে এলে ডাঙায়। অবশেষে তাকে শুইয়ে দিলে তার সেই প্রিয় জায়গাটিতে—সেই অশোক ও পলাশের তলায়।

শেয়ালের তখন শেষ অবস্থা। কুমীর চোখের জলে ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি অমন কাজ কেন করলে শেয়ালভাই ?

শেয়াল কোন রকমে উচ্চারণ করলে—আমি তো পুরাতন হয়ে গেছি বোন! কিছুদিন পরে আমাকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হতোই। আজ একটা সুযোগ পেয়ে, নতুনকে পথের হদিস দিতে ইচ্ছে করেই মৃত্যুকে বরণ করে নিলাম। আমার জন্য দুঃখ করোনা বোন।

কুমীর কাঁদতে কাঁদতে বললে—তুমি আমার ছেলেকে বাঁচাতে এত কষ্ট করলে, আর শেষে কিনা আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হলাম! এ দুঃখ আমি রাখবো কোথায় ভাই!

—তুমি শত্রু-মিত্র সবার ছেলেকে নিজের ছেলের মত ভাবলে, তাহলে কোন দুঃখ থাকবে না তোমার।

কুমীর কী যেন ভাবলে মনে মনে। তারপর বললে—তোমায় কথা দিলাম, একমাত্র ঐ বাঘের ছেলে ছাড়া আর কারও ছেলের গায়ে আমি জীবনে হাত তুলবো না।

শেয়াল বললে—আমার জীবনের বিনিময়ে ঐ বাঘের ছেলের জীবনটাও তোমার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি বোন। ও আমার ছাত্র, আমার ছেলে, আমারই ভবিষ্যৎ। ওরাই তো বংশ বংশ ধরে বাঁচিয়ে রাখবে আমাকে। কথা দাও, ওকে কিছু বলবে না তুমি!

বড্ড করুণ চোখে তাকালে পণ্ডিত। আর ঠিক সেই সময় পাটলও চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছুটে এলে সেখানে। কুমীরকে বললে—

আমায় মেরে ফেলে তোমার ছেলের মৃত্যুর বদলা নাও মাসি। এমন গুরুকে হারিয়ে আমিও আর বাঁচতে চাই না।

সেই চরম দুঃখের সময়েও হাসল কুমীর। বড্ড করুণ সেই হাসি। বললে—যদিও আমার চোখের চামড়া নেই, তবু তোমার শেষ সময়ে কথা দিলাম শেয়ালভাই, ওকে আমি জীবনে কোনদিনই কিছু বলবো না। ও যখন আমাকে মাসি বলেছে তখন বিপদে-আপদে আমিই সবার আগে ছুটে আসবো ওকে সাহায্য করতে।

কুমীর মুখটা নিচের দিকে করে ধীর পায়ে নদীর জলে নেমে গেল। পণ্ডিতেরও বাকরুদ্ধ হল। শরীরে বার দুই হ্যাঁচকা টান দেওয়ার পর চিরকালের জন্য নিথর হয়ে গেল দেহটা। ঠিক সেই সময় ফুলেফুলে ভরা অশোক ও পলাশ গাছদুটো খসিয়ে দিলে কয়েকটা লাল লাল ফুল, অদূরে গাছের কোটরে হুতোমরা শুরু করে দিলে নাকি সুরে কান্না, এখানে ওখানে দীপ জ্বেলে দিলে জোনাকিরা এবং ঘরে ফেরার পথে বুনো হাঁসের দল খসিয়ে দিলে একটি করে পালক।

বাঘের ছেলে তেমনই বসে রইলে চুপচাপ। দূরে চুক চুক করে জল খেয়ে গেল একপাল হরিণ, হারিয়ে যাওয়া একটা মোষের ছানা মাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে সেইখানেই শুরু করলে ডাক দিতে, খরগোশরা ছুটে গেল নদীর দিকে, বড় বড় রুই কাতলা জলের ধার ঘেঁষে জুড়ে দিলে খেলা, তবু নড়তে প্রবৃত্তি হল না বাঘের ছেলের। সে কেবলই ভাবতে লাগলে পণ্ডিতের শেষ সময়ের কথাগুলো এবং সাতদিনে দেখা সাত-সাতটে বনের দৃশ্য।

নাগদন্ত

অশ্রু নদীর তীরে ছিল নিবিড় এক বন। শিরীষে-শিমূলে, অশোকে-কিংশুকে বন যেন ঠাসা ছিল একেবারে। সেখানে বসন্তে গাছে-গাছে নতুন পাতায় রঙ ধরতো, এবং শিমূলরা-বুকের সমূহ রক্তবিন্দুকে আকাশের দিকে উজাড় করে ধরতো, গ্রীষ্মে লাল লাল ফুলে ঢাকা পড়তো গাছপালা, বর্ষায় লাল ঝুমকায় ভরে যেতো শিরীষের ডগাগুলো আর হিজলের শাখা নামিয়ে দিতো লাল লাল হার, শরতে ওলট চণ্ডালের এবং হেমন্তে গুঞ্জাফলের মালা পরতো ঝোপঝাড়গুলো, শীত বাদে সারা বছর জলাগুলোতে লালপদ্মের মেলা বসতো। সারা বছরটা যেন পশ্চিম আকাশে গোধূলির রক্তরাগের মত, ফাগুয়ার রঙের মত, অথবা প্রবালের পাহাড়ের মত লালে লাল হয়ে থাকতো বন। আর ঐ কারণে বনটা সবার কাছে পরিচিত ছিল অলক্ত বন নামে।

রক্তরাগ অলক্ত বনে রক্তখেকো জানোয়ারদের বাস না থাকায় রক্তের হোলি কেউ খেলতো না। বাসিন্দাদের মনও বনের মতই ছিল রাঙা। সেখানকার রাজা নাগদন্ত নামে এক হাতী বেজায় ভালবাসতো বনকে, আর ভালবাসতো প্রতিটি ফুল-পাতা ও পশু-পাখীদের। তার কড়া শাসনে কেউ কারও যেমন অনিষ্ট করতে পারতো না, তেমনই অকারণে তৃণভূমিকে মাড়িয়ে চলা বা গাছের পাতাকে ছিঁড়ে নষ্ট করারও উপায় ছিল না। ফলাহারীর পাকা পাকা ফল খেতো, তৃণ-ভোজীরা কচি কচি পাতা ও ঘাস খেতো, আর গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন গাছপালার নাভিশ্বাস উঠতো তখন সবাই পালা করে জলসেচন করতো। তাই পর্যাপ্ত খাদ্য থাকায় এবং ছোট-বড় সবার নিরাপত্তা থাকায় গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে, সবুজ মাঠের দিকে দিকে গড়ে উঠেছিল তৃণভোজীদের উপনিবেশ।

এমন চমৎকার এক বনের প্রতি লোভ ছিল ভিন বনের হিংসুটে

বাঘ-সিংহদের। নিজেদের বনকে একরকম পশুশূন্য করে ফেলেছিল তারা। দূর থেকে অলক্ত বনের পশুদের নদীতীরে ঘুরে বেড়াতে দেখলে এবং পাহাড় পাহাড় উইঢিবি ও দুগ্‌গা ঠাকরুণের মেড়ের মত বিরাট বিরাট মৌচাককে দেখলে বাঘ-ভালুকের মুখ থেকে লালা ঝরতো। কিন্তু নাগদন্তের আদেশে দিনে রাতে হাতীরা পালা করে পাহারা দিতো বলে এবং জিরাফরা দূরবীনের মত আপন দৃষ্টিকে ভিন বনের দিকে তাক করে থাকতো বলে হানা কেউ দিতে পারতো না।

পাশের বনে বাস করতো অতি ধুরন্ধর এক বাঘ। বয়স হওয়ায় সে আর আগের মত শিকার ধরতে পারতো না। তাছাড়া সে বনে শিকারেরও আকাল ছিল। তাই একদিন মনে মনে ভাবলে সে, এমন খাওয়ার দুঃখ আর সহ্য করা যায় না। এ বনে না খেয়ে মরার চেয়ে অলক্ত বনে গিয়ে খেয়ে খেয়ে হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করা অনেক ভাল।

অন্যান্যদের মত এই বাঘেরও একটি সাকরেদ ছিল। সে ছিল এক শেয়াল। নাম ছিল তার ধূর্তক। ধূর্তক সারাটা জীবন বাঘের তাঁবেদারি করে এসেছে, পর্যাপ্ত উচ্ছিষ্ট পেয়ে এসেছে এবং বুদ্ধিও জোগান দিয়েছে অনেক। আজ বাঘের অবস্থা চরমে ওঠায় তার আর ভালমন্দ কপালে জোটে না। সারা দিনরাত শুধু নদীর তীরে কাঁকড়াদের গর্তে লেজ ঢুকিয়ে বসে থাকে। অনবরত কামড় খেয়ে খেয়ে লেজের অবস্থাও একেবারে কাহিল। তবু পেটের জ্বালা দূর করতে লেজের জ্বালাকে সহ্য করতে হয় এবং গর্ত থেকে কাঁকড়া তুলেই পেট ভরাতে হয়। সে কী দুঃখ তার!

বাঘ একদিন ধূর্তককে ডেকে বললে—ভাগনে, পেটের দুঃখ আর সহ্য করতে পারছিনে! একটা উপায় তুমি বাৎলাও।

উদাস নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধূর্তক বললে—মামাগো, না খেয়ে খেয়ে বুদ্ধিতে আমার ঘুণ ধরে গেছে। কথায় বলে, পেটে ভাত থাকলে বোকাও সেয়ানা হয়, মূর্খ পণ্ডিতের মত আচরণ করে, এমনকি রাজা হতেও সাধ জাগে। আজ তোমার মত আমারও সেই হাড়ির হাল।

বাঘ কিছুক্ষণ ধরে কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—তোমাকে আমি বরাবরই সেয়ানা জানতাম। তাছাড়া তুমি বুদ্ধির বড়াইও করতে একসময়। আজ দুঃখের সময় ঐ অলক্ত বনে বাস করার একটা উপায় খুঁজে বার করে দেখি।

অলক্ত বনের নাম শুনে শেয়াল একেবারে আঁৎকে উঠলে যেন। বললে—মামাগো, নিজের বনে তিন দিনে একটি কাঁকড়া আমার অনেক ভাল। পরের বনে দিনে তিনবার তিনটি করে হরিণ পেলেও স্বস্তি পাওয়া যাবে না। সেখানে নাগদন্তের যা কড়া নজর—তাতে ধরা একদিন পড়তে হবেই হবে। তখন বেঘোরে প্রাণটাও যাবে। তার চেয়ে এই আমরা বেশ আছি।

বাঘমামা ধূর্তকের কথা আদৌ কানে তুললে না। ধমকের সুরে বললে—ঐসব ছেঁদো নীতিকথাগুলো ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখ। ভর পেটেই এগুলো শুনতে ভাল লাগে।

ধূর্তক বললে— শুনেছি, বুড়ো হলে মাথার বিকার আসে এবং মরার আগে যতসব বিপরীত বুদ্ধি এসে ভর করে। তোমারও দেখছি তাই হয়েছে মামা!

বাঘ রেগে বললে—আসলে তোমারই বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। যদি অলক্ত বনে যাওয়ার উপায় বার করতে না পারো তাহলে তোমারই ঘাড়টা ভেঙ্গে দেবো আমি।

ধূর্তক দেখলে দুদিকেই বিপদ। গেলে নাগদন্তের পায়ের তলায় পিষে মরতে হবে আর না গেলে বাঘের খপ্পরে প্রাণ যাবে। এখন উপায়?

অনেক ভেবে ধূর্তক শেষপর্যন্ত অলক্ত বনে যাওয়াই স্থির করলে। বাঘের মত সেও মনে মনে ভাবলে, হাতগুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকাটা জড়ের সামিল। শ্রম ও বুদ্ধি খাটিয়ে যারা লড়াই করে তারাই প্রকৃতপক্ষে জীব নামের যোগ্য। বাঘকে বললে—মামা, বুদ্ধিমানরা সহসা কিছু করে বসে না। একটু ধৈর্য ধরলেই তোমার ভাগনের বুদ্ধির খেলাটা দেখতে পাবে।

বাঘ ফ্যা ফ্যা করে হেসে উঠলে বললে—এই তো চাই! তাছাড়া ভয় তোমার নেই বুঝলে! যারা শাকপাতা খায় তাদের বুদ্ধি মাংসাশীদের মত এত ক্ষুরধার হতে পারে না।

দিন যায়। বাঘ প্রতিদিন শেয়ালকে তাড়া দেয়। আর শেয়াল রোজই আকাশের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে থেকে অলক্ত বনে প্রবেশ করার উপায় খুঁজতে থাকে। একদিন দেখলে, আকাশে সূর্যের গ্রহণ লাগতে শুরু করেছে। তৎক্ষণাৎ একটা বুদ্ধি বিদ্যুতের মত এসে গেল তার মাথায়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আগে গোঁফ-জোড়াটা কামালে। তারপর মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া মাটির তিলক কাটলে মাথায়। অবশেষে অশ্রু নদী সাঁতরে হাজির হলে অলক্ত বনে।

পাহারায়রত হাতীর পাল কিম্ভূতকিমাকার এই জীবটাকে দেখে ছুটে এলে কাছে। একজন তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে আচ্ছা করে চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তুই কে? নদী সাঁতরে কেন এসেছিস এই বনে? আমরা ভিন বনের বাসিন্দাদের যে বরদাস্ত করি না—তা কী তোর জানা নেই?

ততক্ষণে আকাশের সূর্য একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদের ছায়ায়। হাতীদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ধূর্তক সামনের পা দুটো আকাশের দিকে তুলে ধরে গদগদ কণ্ঠে যেন আপন মনেই উচ্চারণ করলে—হে প্রভু সূর্যদেব। বনে বনে তুমি তোমার মহিমা প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলে আমাকে। ওরা আমায় মেরে ফেলতে চাইছে বলে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার আলো থেকে বঞ্চিত কর না ওদের। অবোধ ওরা, বুঝে না তোমার মহিমা। অতএব ওদের ক্ষমা কর তুমি।

শেয়ালের কথা শুনে স্তম্ভিত হলে হাতীর দল। তারপর আকশের দিকে তাকাতেই তারা ভয়ে শিউরে উঠলে। ভাবলে, নিশ্চয়ই ইনি হচ্ছেন সূর্যদেবের দূত! তা না হলে এমন অসময়ে এবং নির্মেঘ আকাশে সূর্য মুখ ঢাকে কেন?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা ধূর্তককে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলে

তার সামনে। বললে—হে ঠাকুর, আমরা তোমায় চিনতে পারিনি। না জেনে যে অন্যায় করেছি—তার জন্য ক্ষমা কর তুমি এবং সূর্যদেবকে বল, এই মূহূর্তে তিনি যেন তাঁর মুখের ঢাকনা সরিয়ে ফেলেন।

ধূর্তক বক্র কটাক্ষে একবার তাকালে সবার দিকে। তারপর একগাল হেসে বললে—তোমরা সবাই চোখ বন্ধ করে মনে মনে সূর্যের ধ্যান কর। আমিও প্রার্থনায় বসছি। নিশ্চয়ই সূর্যদেব ক্ষমা করবেন তোমাদের।

হাতীর পাল চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেও শেয়াল মাঝে মাঝে পিটপিট করে তাকাচ্ছিল আকাশের দিকে। গ্রহণ ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—তোমাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়েছেন সূর্যদেব। ঐ দেখ, আগের মতই কিরণ দান করছেন তিনি। আর তোমাদের কোন ভয় নেই।

হাতীর পাল চোখ মেলেই বিস্মিত হয়ে গেল। একটু আগেই অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল চারদিক। আর এখন আলোর থৈ থৈ বন্যা। শেয়ালের প্রতি তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো এবং তাকে একজন পিঠে তুলে নিয়ে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলে। অন্যান্যরা চিৎকার করে বললে—ওগো, বনের পশুরা! তোমরা কে কোথায় আছো ছুটে এসো। আজ বনের পশুদের উদ্ধার করতে স্বয়ং সূর্যদেবের অনুচর ছুটে এসেছেন। তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনে জীবন পবিত্র করো।

দলে দলে বনের পশু ছুটে এলে প্রণাম জানাতে এবং মুণ্ডিত মস্তক ও তিলকধারী বিচিত্র এই জীবটকে দেখে তারা এমন মোহিত হয়ে গেল গেল যে খাওয়াদাওয়া ভুলে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলে।

নাগদন্ত তখন পাহাড়ের চূড়া থেকে বন পর্যক্ষেণ করছিল। একসময় পশুদের হৈ-হল্লা শুনে পাহাড় থেকে নেমে এসে দাঁড়ালে পশুদের পুরোভাগে। হাতীর পিঠে ধূর্তককে দেখে সে ঠিকই বুঝে নিল, এটি একটি ধূর্ত শেয়াল ছাড়া কেউ নয়। এসেছে ধর্মের নাম করে পশুদের সর্বনাশ করতে। তাই পশুদের বললে—এ কী করছো তোমরা! এক বিদেশী গুপ্তচরকে পিঠে করে নাচছো?

কৃত্রিম ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়লে ধূর্ত। বললে—তোমাদের এই রাজা ঘোরতর নাস্তিক! কথায় বলে, রাজার অধর্মে প্রজার সর্বনাশ। তোমরা ওর কথা শোন না। তাহলে এক্ষুণি সূর্যদেব কুপিত হয়ে আলো দেওয়া বন্ধ করবে।

নাগদন্ত শিউরে উঠলে। বুঝতে পারলে, আজকের সূর্যগ্রহণের সুযোগ নিয়ে পশুদের বোকা বানিয়েছে। চিৎকার করে বললে—তোমরা বিশ্বাস করোনা ওর কথায়। ও ধূর্ত, শঠ, প্রবঞ্চক। আজকের সূর্যগ্রহণ দেখিয়ে তোমাদের ধোঁকা দিয়েছে।

এই প্রথম বনের পশুরা অবাধ্য হল নাগদন্তের। তারা সমস্বরে প্রতিবাদ জানালে—আমরা যা চোখে দেখেছি, তাকে অবিশ্বাস করতে পারিনা। আপনি প্রকৃতই পাপী। তাই এমন পাপ কথা মুখে আনছেন। এই মুহূর্তে এঁর কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন!

নাগদন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললে—না। যাকে তোমরা সূর্যদেবের অনুচর বলে মনে করছো, সে একটা হীন শেয়াল ছাড়া কেউ নয়। ওকে হত্যা করে বনকে বাঁচাও। পশুরা রাজার কথায় কানে হাত দিলে। আর ধূর্তক দেখলে, একমাত্র নাগদন্ত ছাড়া ওষুধ সবাইকে ধরেছে। ধীর ও শান্ত সুরে বললে—তোমাদের এই মহাপাপী রাজার হাত থেকে বনকে রক্ষা করতেই সূর্যদেব আমায় পাঠিয়েছেন। ও এখন বৃদ্ধ হওয়ায় বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। ওকে বিতাড়িত কর এবং তোমাদের কোন ধার্মিক ও শক্তিমানের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ কর। তাহলেই সূর্যদেব সন্তুষ্ট হবেন এবং সবাইকে আশীর্বাদ জানাবেন।

পশুরা একযোগে চিৎকার করে বললে—আমরা আপনাকেই রাজা হিসেবে পেতে চাই। আর কাউকে নয়।

অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ধূর্তক বললে—তাতো হয়না ভাই! তোমাদের বনে পড়ে থাকলে অপর বনের পশুরা কেমন করে উদ্ধার পাবে! আমি যে প্রভু সূর্যের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! তাঁর মহানবাণী জগতে আমাকে প্রচার করতেই হবে।

পশুরা কাঁদো কাঁদো হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তা হলে আমাদের উপায় কী হবে ?

হেসে ধূর্তক বললে—তার জন্য কোন চিন্তা করতে হবে না তোমাদের ! তোমরা যদি চাও, তাহলে সূর্যের মত বলশালী তাঁর কোন একটি অনুচরকে ডেকে আনতে পারি।

নাগদন্তের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। শেষবারের মত সে সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে বললে—হে আমার অবোধ প্রজাগণ! এক নামগোত্রহীন অপরিচিতের কথায় তোমরা ভুলে যেওনা। আমার বদলে তোমাদের মধ্যে যে কোন একজন রাজা হও। আমি তাকে অভিবাদন জানাবো এবং তার আদেশ মেনে চলবো। ভিন বনের শত্রুকে ডেকে এনো না।

পশুরা সবাই একযোগে তিরস্কার করলে নাগদন্তকে। তারপর ধূর্তককে বললে—আর দেরি নয়। এই মুহূর্তে আমরা নতুন রাজা চাই। চাই, সূর্যদেবের কোন অনুচরকে।

অশ্রু নদীকে সাঁতরে পার হয়ে ধূর্তক যখন নিজের বনে প্রবেশ করলে তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বাঘমামা তখন আস্তানায় বসে বসে একখানা শুকনো হাড়কে চিবুচ্ছিল। খুশি খুশি মুখে ভাগনেকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—কী ভাগনে, কিছু সুবিধে করতে পারলে ?

অট্টহাস্যে একেবারে ফেটে পড়লে ধূর্তক। বললে—মামাগো, তোমার ভাগনে দিনকে রাত করতে পারে। এই সামান্য কাজটা করতে পারবেনা !

বাঘ বললে—হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা খুলে বল দিকিনে ? ক্ষিধের জ্বালা যে আর সহ্য করতে পারছি না।

ধূর্তক আরও একচোট হেসে নিয়ে বললে—অলক্ত বনের রাজা এখন তুমি ! বুঝলে মামা ! তবে সাবধান ! আপাততঃ খুব গোপনে গোপনে কাজ হাসিল করতে হবে। তারপর কায়দা করে ওদের রাজা ঐ নাগদন্তটাকে ঘায়েল করতে পারলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না।

বাঘ জিজ্ঞাসা করলে—ঐ নাগদন্তটাকে বুঝি বাগে আনতে পারনি তুমি ?

ধূর্তক বললে—না মামা ! দেহের তুলনায় মাথাটা নিতান্ত ছোট হলে

কী হবে, ওর বুদ্ধি যথার্থই আছে। তবে ভয় নেই। বনের সব পশুই এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। নাগদন্তের কথায় কেউ তোয়াক্কা রাখছে না।

—তাহলে কী করতে হবে আমায়? জিজ্ঞাসা করলে বাঘমামা।

—আমারই মত গোঁফ কামাও এবং মাথা মুড়াও। অলক্ত বনে প্রচুর চন্দন গাছ দেখে এসেছি। নদী সাঁতরে তীরে উঠলেই তোমার সারা গায়ে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে ঐ বোটকা বোটকা গন্ধটাকে বশে আনতে হবে। তারপর নামাবলী গায়ে জড়িয়ে হাজির হবে পশুদের সামনে। প্রথমে দু-দশটা ধর্মকথা শোনাবে। অবশেষে একটু রাত হলেই লেগে পড়তে হবে কাজে। তবে হ্যাঁ, বেফাঁস কিছু বলে বসোনা বা হুট করে কোন কিছু করতে যেও না। যা করবার সব আমিই করবো।

ধূর্তকের কথামত বাঘমামা বিকেলের দিকে হাজির হলে অলক্ত বনে। তার গায়ের কালো কালো ডোরার উপর পুরু করে চন্দনের প্রলেপ চাপালে ধূর্তক এবং মাথায় দিলে রক্ত চন্দনের ফোঁটা। একটা উপলখণ্ডের উপর তাকে বসিয়ে দিয়ে ধূর্তক শুরু করলে চিৎকার—ওগো, অলক্ত বনের অধিবাসীরা! তোমরা দেখে যাও তোমাদের রাজাকে। জীবন সার্থক কর তাঁকে দর্শন করে এবং ইহকালের পাথেয় সংগ্রহ করে নাও তার নীতিকথা শুনে।

হাজার হাজার পশু ছুটে এল নতুন রাজাকে প্রণাম জানাতে। এত পশুকে সামনে দেখে বাঘের জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করলে। খাবারের খুসবু তার মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিলে। থরথর করে কাঁপতে শুরু করলে তার চোয়াল দুটো, লম্বা জিভটাও বার বার বেরিয়ে পড়লে। অবশেষে শেয়ালের কথা বেমালুমভাবে ভুলে গিয়ে সামনের হরিণগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে এবং নিমিষের মধ্যে গোটাকয়েক মুণ্ডু কুড়মুড় করে চিবিয়ে ফেললে।

আচমকা এমন একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল গেল পশুরা। বেগতিক থেকে শেয়াল তীরবেগে ছুটে পালালো অশ্রু নদীর দিকে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল নাগদন্তও। বাঘের কাণ্ড দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলে না। ঝাঁপিয়ে পড়লে বাঘের উপর।

এতক্ষণে বাঘের চৈতন্যোদয় হলো। সেও চালালে পাল্টা আক্রমণ। চেপে বসলে একেবারে নাগদন্তের শুঁড়ের উপর। তারপর ধারালো দাঁত ও নখ দিয়ে ফালাফালা করে ফেললে নাগদন্তের চোখ, মুখ ও মাথাকে।

পশুরা হতবাক হয়ে দেখছিল বাঘ ও নাগদন্তের যুদ্ধ। যখন দেখলো, নাগদন্তের মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে এবং কাতরভাবে আর্তনাদ করছে, তখন আর স্থির থাকতে পারলে না। ছুটে এল হাতীর পাল, ছুটে এল ঘোড়ারা এবং ছুটে এল বুনো মহিষ ও বরাহের দল। চারদিক থেকে ঘিরে ফেললে সবাই। তারপর হাতীর পাল বাঘকে জোর করে নামিয়ে এনে পায়ে তলায় চেপে ধরলে। ঘোড়াদের পায়ের চাটে, মহিষের শিঙের ঘায়ে, বরাহের দাঁতের আঘাতে বাঘ মামা একেবারে হুক্কা পেয়ে গেলে।

নাগদন্তের তখন অবস্থা একেবারে কাহিল। পশুরা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তাদের রাজার কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলে। লজ্জায় ও অনুতাপে দগ্ধ হতে হতে জানালে, আর কখনও তারা বিদেশীকে বিশ্বাস করবে না।

নাগদন্তের তখন কথা বলার শক্তি নেই। সে কোন রকমে উচ্চারণ করলে—ভুল সবাই করে। আর ভুলকে সংশোধনও করতে হয়। আশা করি এমন ভুল তোমরা আর করবে না।

পশুরা শপথ নিয়ে বললে—না, এমন ভুল আর কখনও হবে না। নাগদন্ত বললে—তোমরা সেই গানটা একবার গাও দেখি। আমি গান শুনতে শুনতে চিরকালের জন্য চোখ বন্ধ করবো।

পশুরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরলে--

বন মোদের মা, বনের ছেলে সবাই ভাই,
আমরা বনেরই গান গাহি।
আমরা এই করেছি পণ,
শত্রু এলে শক্ত হাতে করবো মোরা রণ,
আমরা ডরাইনা কখন।

টুনি

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় একটা খেঁকি কুকুর। নাম তার টুনি। পিঠের কোথাও কোথাও লোম উঠে গেছে, কোথাও দগদগে ঘা, আবার কোথাও ঘা-গুলো শুকিয়ে কোঁচকানো সাদা-কালোয় ছোপ ছোপ দাগ।

টুনিকে দেখতে পেলে দূরদূর করে তাড়ায় সবাই। ছেলেরা দেখতে পেলে ঢিল ছোঁড়ে। যখন পিঠের উপর একের পর এক ঢিল পড়তে শুরু করে তখন টুনি তার শীর্ণ লেজটা পেটের তলায় চালান করে দিয়ে কুঁজো হয়ে যেন মাটির সঙ্গে লেপ্টে যায়। তারপর আকাশ-ফাটানো চিৎকার করতে করতে নিরাপদ কোন আশ্রয়ের দিকে দ্রুত পালিয়ে যায়। পাড়ার বৌ-ঝিদের দুচোখের বিষ। পাছে হেঁসেলে ঢুকে হাঁড়ি-কুঁড়ি নষ্ট করে—এই ভয়ে ত্রিসীমানায় কেউ দেখতে পেলে লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করে।

হালদার বাড়ীর পেছনে বড় ছাইগাদাটার নিজের মাপের একটা গর্ত করে রোজ রাতে ঘুমায় টুনি। গাছ থেকে একটা পাতা পড়লেও জুড়ে দেয় চিৎকার। ছেলেকোলে মায়েরা রাতের মধ্যে দশবার টুনির মরণ কামনা করে। আর বুড়োরা ভাবে, বিনিপয়সার চৌকিদার।

হালদার বাড়ীর রিনা বয়সে সাত বছরেরও কম। গাঁয়ের ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। একমাত্র সেই-ই কিছু বলেনা টুনিকে। টুনি নামটাও তারই দেওয়া। সকালে বিকেলে ইস্কুলে যায়, মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও বারান্দায় বসে মুড়ি চিবোয়। আর ঠিক তক্ষুনি কোথা থেকে ছুটে আসে টুনি। কান দুটো খাড়া করে কুৎকুতে চোখে বার-বার তাকায় রিনার দিকে। কখনও বা একটু দূরে ঘাড়টাকে মাটির উপর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে এবং একদৃষ্টিতে রিনার খাওয়া দেখে। রিনার খাওয়া

শেষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু-দশটা মুড়ি পরমানন্দে টপাটপ মুখে পুরে ফেলে টুনি। রিনার খুব ভাল লাগে। কাছে পিঠে মা না থাকলে এক মুঠি-মুড়ি তার মুখের কাছে ফেলেও দেয়। যখন লম্বা জিভটা বার করে টুনি সেগুলো চেটেপুটে খায় তখন অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে রিনা। ভাবে, মাত্র একমুঠি মুড়ি টুনিকে দিলে মা কেন এত রাগ করে? গরুগুলোকে তো গাদা গাদা ভাত দেওয়া হয়, পুষি বেড়ালটাকেও মা খেতে দেয়, কিন্তু টুনির বেলায়?

যখন মার মনটা ভাল থাকে তখন রিনা বলে—টুনিকে দুটি খেতে দিই মা! সঙ্গে সঙ্গেই মা রেগে আগুন হয়ে উঠে। বলে—পথের একটা খেঁকি কুত্তাকে লাই দেওয়া! খবরদার বলছি! খেতে দিলে তোর পিঠের ছাল তুলে দেবো।

রিনার মনটা মুহূর্তে কুঁকড়ে যায়। ভেবে পায়না, টুনির নাম শুনলে মা কেন জ্বলে উঠে? ঘরে ঢুকে হাঁড়ি-কুঁড়ি নষ্ট করবে বলে। কিন্তু ওপাড়ার ভোলাদের কুকুরতো করেনা!

মাঘ মাস এল। রিনাদের ছাইগাদায় চার-চারটে বাচ্চা দিলে টুনি। লাল লাল বাচ্চা। সারা গাটা রেশমের মত চকচকে লোমে ঢাকা। বিচ্ছিরি হাড়জিরজিরে টুনিটার এমন নাদুস-নুদুস বাচ্চাদের দেখে অবাক না হয়ে পারলে না রিনা। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই ছুটে যায় বাচ্চাদের কাছে। কোলে করতে ভারি ইচ্ছে। কিন্তু মায়ের জন্য সবসময় পারে না। কুকুরছানাকে ছুঁইলে নাকি চান করতে হয়।

কয়েকদিন পরে চোখ ফুটল বাচ্চাদের। বাচ্চাগুলো আরও সুন্দর এবং আরও গোলগাল হয়ে উঠেছে। কাছে গেলে কুঁই কুঁই করে, নয়ত জিভ বার করে চাটতে আসে। টুনিকে এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। মাঝে-মাঝে কোথা থেকে ছুটে আসে, আর পচা-দুর্গন্ধ কী সব উগরে দেয় বাচ্চাদের কাছে। সেই দুর্গন্ধে নাকে কাপড় চাপা দিতে হয়।

রিনার মা ভয়ানক রেগে উঠলে বারবার বলে, এ নরক যন্ত্রণা আর সহ্য করা যায় না। সন্ধ্যায় রিনার বাবা বাড়ীতে এলে ঝগড়া শুরু করে। খালের ওপারে বাচ্চাদের ফেলে আসা হয়নি বলে একেবারে মুখিয়েও উঠে যেন। যেদিন রিনার মা যখন ভয়ানকভাবে ঝগড়া করলে, তখন রিনার বাবা আশ্বাস দিলেন—আগামীকাল যেমন করে হোক বাচ্চাগুলোকে খালের ওপাশে ফেলে আসবেই।

রিনার মনটা হাহাকার করে উঠলে। মা ঝগড়া করে চলে যাওয়ার পর বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রিনা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা বাপী? তুমি কী সত্যি কুকুরবাচ্চাগুলোকে ফেলে আসবে?

গম্ভীর গলায় বাবা বললেন—হ্যাঁ!

মুখটাকে হাঁড়ির মত করে এবং ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে রিনা বললে—না, কখ্খনো না। আমি কিছুতেই ওদের দেব না।

পরদিন সকালে টুনির একটানা চিৎকার এবং চারুবৌদির নাকিসুরে কান্না শুনে রিনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখদুটো রগড়াতে রগড়াতে ছুটে এলে খিড়কির দোরের কাছে। দেখলে, চারুবৌদি এবং রিনার মা একই সঙ্গে টুনি এবং তার বাচ্চাদের মরণ কামনা করছে। আর টুনিটা চিৎকার করতে করতে এবং একটা পা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত পায়ে পালিয়ে যাচ্ছে ছাইগাদার দিকে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা শোনার পর রিনা বুঝতে পারলে, দুহাতে এঁটো বাসন নিয়ে চারুবৌদি পুকুরঘাটে এসেছিল। হাতজোড়া থাকায় খিড়কির দোর দিতে পারেনি। হাত-পা ধুয়ে ছবি কাকিমার সঙ্গে কথা দুটো বলতে যেটুকু সময় গেছে তারই ভেতরে টুনি রান্নাঘরে ঢুকে পান্তা হাঁড়িতে মুখ দিয়েছে। এতগুলো পান্তাভাত এবং হাঁড়িকুঁড়ি নষ্ট হয়েছে শুনলে মানুষটা যে একেবারে ক্ষেপে যাবে, সেই কথা বার-বার ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে আর নাম না ধরেও রিনার মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অভিশাপ দিচ্ছে।

ঝগড়ায় রিনার মাও কম পটু নয়। সেও বাঁকা বাঁকা কথায় চারু-বৌদিদের শ্রাদ্ধ দিচ্ছে।

আজ দুপুরে হারুদা বাড়ী ফিরলে চারুবৌদিকে যে বেদম প্রহার করবে—তাতেও রিনার এতটুকু দুঃখ হল না। বরং টুনির পা ভেঙ্গে দিয়েছে বলে তার ভয়ানক রাগ হল। তুমি দোর খুলে রাখবে, গপ্‌পো করবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর কুকুরে ঢুকবেনা? ক্ষিধে পেয়েছে বলেই না সে চুরি করেছে! একদিন তাকে দুটো খেতে দিয়েছো? সেদিন হারুদা যখন তোমাকে খেতে না দিয়ে রান্নাঘর বন্ধ করে এসেছিল, তখন তুমি মুড়ির টিনটা শেষ করে দাওনি? সামন্তদের বাগানে নারকেল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েনি হারুদা? টুনিও চুরি করেছে। তাতে হয়েছে কী?

টুনি ততক্ষণে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হয়েছে তার বাচ্চাদের কাছে। রিনা ধীর পায়ে মায়ের অলক্ষ্যে এগিয়ে গেল ছাইগাদার দিকে। টুনি এবার সকরুণ দৃষ্টিতে তারদিকে তাকিয়ে চোখটা নামিয়ে নিলে। তারপর কুঁই কুঁই করে ডাকলে বাচ্চাদের। বাচ্চারা ঘিরে ফেলতেই টুনি পেট ফুলিয়ে এবং মুখটা নিচের দিকে করে বার দুই হ্যাঁচকা টান দিলে সারা শরীরে। গলগল করে মুখ থেকে বেরিয়ে এলে একগাদা পান্তাভাত। বাচ্চাগুলো কুঁই কুঁই করতে করতে চেটে পুটে খেতে শুরু করলে। আর টুনি অতিকষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে একবার কাতর এক চিৎকার করে ভাঙ্গা পাটা উপরে রেখে শুয়ে পড়লে ছাইগাদায়।

পুকুরঘাটে কাজ করছিল রিনার মা। একসময় রিনার প্রতি দৃষ্টি গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে উঠলে যেন। চিৎকার করে বললে—তোর বাপ বেটির ঐ আদরের কুকুরগুলোকে আজ যদি বিদেয় না করি তাহলে আমি হরি চক্কোত্তির মেয়ে নই। যত সব আপদ-বালাই জুটিয়ে আনবে আর পাঁচজনে আমাকেই পাঁচকথা শোনাবে।

কিছুক্ষণ আগে চারুবৌদি যেসব বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়েছিল, তার জোরালো প্রতিবাদ করতে না পারায় রিনার মার বুকের ভেতরটাতে যেন তুষের আগুনের মত দহন চলছিল। প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছিল না। এবার রিনাকে দেখে আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়লে

যেন। লাভাস্রোতের মত একনাগাড়ে বেরিয়ে এলে অশ্রাব্য গালিগালাজ।

রিনা মায়ের বকুনিকে আদৌ আমল দিলেনা। পরন্তু বললে—একবার দেখে যাও মা।

দাঁত খিঁচিয়ে উঠলে রিনার মা। বললে—তোর দেখা আমি বার করে দিচ্ছি, দাঁড়া। পিঠের ছাল তুলে দেবো।

পিঠের ছাল উঠে যাওয়ার ভয় রিনা আদৌ করলেনা। বরং জেদের সঙ্গেই বললে—ও মা, একবার দেখে যাও না!

রিনার মা কী ভেবে বিড় বিড় করে বকতে বকতে এগিয়ে গেলে রিনার কাছে। রিনা বললে—দেখেছো মা, টুনি তার বাচ্চাদের কত ভাত এনে দিয়েছে।

টুনিটা করুণ দৃষ্টিতে একবার তাকালে রিনার মায়ের দিকে। অস্থি চর্মসার তার দেহ, আর চার চারটে নাদুস নুদুস বাচ্চা। নিজের জীবনের মায়া না রেখে ও কেবল চুরিই করে বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্যে।

হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে উঠলে রিনার মা। ভেবে পেলেনা, নিজের জীবন বিপন্ন করে টুনি তার বাচ্চাদের কেন খাওয়াচ্ছে? ওর কী কাজে লাগবে ঐ বাচ্চারা।

আর দাঁড়ালে নারিনার মা। একবার রিনার দিকে এবং একবার টুনির ঐ বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে করতে ঘাটে চলে গেলে।

তিতির ও ইঁদুর

খেজুর গাছের ডগায় রাশি রাশি সূচের মত কাঁটার আড়ালে বাসা বেঁধেছে একজোড়া তিতির। আর তাদেরই বাসার পাশে ঠাঁই করে নিয়েছে এক গেছো ইঁদুর। ইঁদুরটার আবার দশ দশটা ছানা। লাল লাল। চোখ ফোটেনি একটারও।

তিতিরদেরও তিন-তিনটে ছানা। সবে পালক গজিয়েছে, তবু উড়তে পারেনা ভালভাবে। কিন্তু বেজায় দুষ্টু হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। বাসায় থাকতে চায়না একটুও। লাফ দিয়ে নেমে পড়তে চায়, শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, নয়ত কুক্ কুক্ করে গান ধরতে চায়। মা শাসন করে, বাপ পই পই করে নিষেধ করে ও ভয় দেখায়। তবু কী তারা শোনে? অগত্যা তাদের সামলাতে বাপ-মায়ের একজন না একজনকে সব সময় বাসায় পড়ে থাকতে হয়।

ইঁদুরের তাই বেজায় সুবিধে। খেজুরের পাতার সঙ্গে যারা নিজেকে বেমালুমভাবে মিশিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘুরে ঘুরে পাখীরছানা ও ইঁদুরছানাদের চুরি করে খায়—সেই সব সব্জে সব্জে লিকলিকে লাউডগা সাপরা তিতিরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। আর রাতে পেঁচারাও এত বড় বড় পাখাদের ধারে পাশে ভিড়তে সাহসী হয় না। তাছাড়া বিষাক্ত শুঁয়াওয়ালা সবুজ কীটগুলো তথা খেজুরে বোড়াগুলোও যত নিজেকে পাতার সঙ্গে মিশিয়ে দিক না কেন তিতিরদের চোখে ধরা পড়ে যায় এবং তিতিররা টপাটপ ওদের মুখে পুরে দেয়।

তিতিররা ইঁদুরকে কিচ্ছুটি বলে না। আহা বেচারা! দুর্বল বলে চারদিকে ওদের শত্রু। তাইতো রাতে যখন ইঁদুরটা খাবারের খোঁজে বেরিয়ে যায় তখন ওরাই আগলায় তার ছানাদের।

সেদিন সকাল থেকে একনাগাড়ে চলছিল রিমঝিম বৃষ্টি। বাসা ছেড়ে বেরুবার কোন উপায় ছিল না। দুপুরের দিকে আকাশটা

একটু ফাঁকা হওয়ায় পুরুষ পাখীটা উড়ে গেল খাবারের খোঁজে। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত যখন সে ফিরে এলে না তখন তিতির গিন্নী মহা ভাবনায় পড়লে। খু-উ-ব জোরে ডাক দিলে পু-উ-উ-পু পু। অর্থাৎ তুমি কোথায়—কো-থা-য়।

সাড়া না পেয়ে আরও জোরে—আরও জোরে—ডাক দিলে—ওগো ফিরে এসো, ফিরে এসো! বাদলা দিনে বেশীক্ষণ বাহিরে নয়!

তথাপি কোন জবাব পেলেনা তিতির গিন্নী। এবার দস্তুরমত ভয় পেলে সে। ভাবলে, নিশ্চয়ই কোন শিকারীর ফাঁদে পা দিয়েছে। তা নাহলে তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না কেন, আর ফিরেই বা আসছে না কেন?

উপায় না দেখে ছানাদের সাবধান করে দিয়ে, তলায় দাঁড়াশদের ও উপরে ধ্যাবড়া মুখো পেঁচাদের ভয় দেখিয়ে উড়ে গেল সাথীটির খোঁজে।

কত ঝোপঝাড়, কত মাঠ, কত সব্জির খেত পার হয়ে গেল। তবুও দেখা পেলে না। অবশেষে বকুলতলা পেরিয়ে নিমু বৈরাগীর পোড়ো আখড়াবাড়ীতে—যেখানে সারাদিনভর গংগা ফড়িংরা ও কাঠি ফড়িংরা পতপত করে ঘুরে বেড়ায়, বাদলা দিনে কেঁচোরা মাটিতে গড়াগড়ি দেয় এবং হেলে সাপরা কিলবিল করে—সেইখানেই দেখলে, শিকারীর ফাঁদে পা দিয়ে ছটফট করছে তার সাথীটি।

সহসা চোখে যেন অন্ধকার দেখলে তিত্তির গিন্নি। তারপর আর্তনাদ করতে করতে এগিয়ে যেতে চাইলে সাথীটি চিৎকার করে উঠলে। বললে—আর একটি পাও এগিও না। চারদিকে মরণ ফাঁদ। আমার জন্যে দুঃখু না করে বাসায় ফিরে যাও এবং ছানাদের দেখাশোনা কর। আমার যা হবার হোক গে!

তিতির গিন্নী কী যেন ভাবলে একবার। তারপর বাসায় উড়ে গিয়ে ছানাদের আদর করতে করতে বললে—তোদের বাপ শিকারীর ফাঁদে ধরা পড়েছে। আমি যাচ্ছি তাকে ছাড়িয়ে আনতে। যদি না পারি তাহলে আমাকেও মরতে হবে। তখন তোরা একটু সামলে

সুমলে চলবি, বাসার ধারে পাশে খাবার খুঁজে খাবি, আর শত্রুদের দেখলে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়বি বাসায়।

ঠিক সেই সময় ইঁদুর তার ছানাপোনাদের খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল। তিতির গিন্নীর কথা শুনে ভয়ে আঁৎকে উঠলে সে। নিজের ছানাপোনাদের পরিণাম ভেবে কেঁদে কেঁদে ছুটলে তিতিরের বাসায়। ধরা গলায় বললে—শিকারীর শক্ত ফাঁদকে তুমি তো কাটতে পারবে না দিদি! উল্টে তুমিই জড়িয়ে পড়বে ফাঁদে। তার চেয়ে পিঠে করে আমাকেই নিয়ে চল, ফাঁদ কাটায় আমাদের জুড়ি কেউ নয়।

তিতির গিন্নী বললে—আমাদের জন্য কেন এত বিপদের ঝুঁকি নেবে বোন! তোমার আবার দশদশটা ছানা, ছানারা আবার তোমার দুধ খায়। তুমি না থাকলে ওরা সবাই যে মারা পড়বে।

ইঁদুর বললে—তুমি মিছেই ভয় করছো দিদি। শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার অনেক কসরত আমার জানা আছে। তবু যদি ভয় কর, তাহলে দূরে থেকে সজাগ দৃষ্টি দিও এবং কোন শত্রুকে দেখলে সাবধান করে দিও। চল, আর দেরি নয়।

এদিকে শিকারীটা জোড়া তিতিরকে ঘায়েল করতে ওৎ পেতে বসে আছে। ওরা ভালভাবেই জানে তিতিরদের স্বভাব। একটাকে বাঁধাতে পারলে আর একটাও ছুটে আসবে এবং বিলাপ করতে করতে জড়িয়ে পড়বে ফাঁদে। তাছাড়া সাথীকে যখন একবার দেখে গেছে, তখন নির্ঘাৎ ফিরে এল বলে!

তিতির গিন্নী পুনরায় ফিরে আসতে শিকারীর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠলে। আড়াল হয়ে গেল শেওড়া গাছের আড়ালে। কিন্তু তিতির গিন্নী তাকে ঠিক দেখে নিয়েছে। শিকারীর কাছ থেকে দূরে একটা ঝোপের আড়ালে ইঁদুরকে নামিয়ে দিয়ে ইঁদুরেরই কথামত জুড়ে দিলে বিলাপ এবং একটু একটু করে এগিয়ে যেতে শুরু করলে সাথীটির দিকে।

শিকারীর তখন সময় যেন আর কাটতে চায় না। এই বুঝি আর

একটা জড়িয়ে পড়লো ফাঁদে। এক একটা নিমেষ যেন এক এক প্রহরের মত মনে হল।

হঠাৎ ঘটে গেল এক অবাক কাণ্ড! ফাঁদে আটকে পড়া তিতিরটা একসময় ডানা মেলে উঠে গেল আকাশে। মনে হল, কালোমত কী একটা ঝুলছে তার গলায়। এদিকে তাকে উড়তে দেখে তিতির গিন্নীও হাওয়া।

বাসায় ফিরে তিতির ও তিতির গিন্নী উভয়েই ইঁদুরবোনকে খুব করে কৃতজ্ঞতা জানালে। উভয়েই বললে—ভাগ্যে ইঁদুরবোন ছিল, তা না হলে আজ যে কী হতো!

সূয্যি মামার মেয়ে

শরতের বিকেল। সাগর বুকে সারি সারি নৌকার পালের মত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ অজানা কোন এক শালবনের দিকে গা-ঢাকা দেওয়ার জন্যে তরতর করে ছুটে চলেছে। সূয্যি মামার ভারি আনন্দ! দুষ্টু খোকা-খুকুরা যেমন মুখে মায়ের আঁচল জড়িয়ে লুকোচুরি খেলা খেলে, তেমনই সূয্যিমামাও যেন একবার সাদা ওড়নার আড়ালে মুখ ঢাকছে আর পরক্ষণে মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে হিহি করে হাসছে।

সাদা সাদা মেঘের টুকরোর সঙ্গে আনন্দে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে দুধের মত সাদা বকরাও। তারাও মেঘের মত উধাও হয়ে যেতে চাইছে, দিগন্তে বিলীন হয়ে যেতে চাইছে, নীল নীল আকাশের বুকে হারিয়ে যেতে চাইছে।

খুশির আমেজ মাটির বুকেও। গাছ-পালা, খাল-বিল, পথ-ঘাট, সবাই যেন খিলখিল করে হাসছে। শুধু আনন্দ নেই মিঠুনের মনে। তাকে প্রায়ই অসুখে ভুগতে হয়। মায়ের কড়া নজরে একরকম সব-সময় ঘরের ভেতরে শুয়ে শুয়ে কাটাতে হয়, নয়ত জামাকাপড় মুড়ি দিয়ে খেলাঘরের পুতুলের মত বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকতে হয়।

আজ কয়েকদিন ধরে আবার মিঠুনের জ্বর কাটছেনা। বারান্দায় খাটের উপর গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল সে। ঘুম না আসায় আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আলোর লুকোচুরি খেলা দেখছিল। আর মনে মনে ভাবছিল মৃদুল হাওয়ায় সবুজ ধানক্ষেতের দোল খাওয়ার কথা, সাদা সাদা শালুক ফুলে ভরা জলার ধারে সারি সারি বকের কথা এবং মাথার উপরে ভেসে থাকা ঝাঁকে ঝাঁকে গঙ্গাফড়িংদের কথা।

পূবের মাঠ থেকে ভেসে আসছিল ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি। মনে হলো, জলার ধারে ছিপ ফেলতে ফেলতে ঝগড়া বেধেছে। হঠাৎ

মিঠুনের মনটা কেমন যেন অবাধ্য হতে চাইলে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো মাঠের পানে—যেখানে শালুক বনে ডাহুকরা ছানাপোনাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাশঝাড়ের আড়ালে কুবো পাখীরা চিৎকার করছে, আর ছেলেমেয়েরা ছিপ ফেলে ছোট ছোট মাছ ধরছে।

একসময় মিঠুনের বুকে যেন অভিমানের পাথর জমে উঠলে। সবাই দল বেঁধে হাসছে, ছুটোছুটি করছে, ছিপ ফেলছে, মাছ ধরছে, আর একা তাকেই কেবল শুয়ে থাকতে হয়েছে বিছানায়। মায়ের উপর রাগও হল তার। বিছানা থেকে উঠে সোজা মাঠের দিকে ছুটে যেতে চাইলে সে। কিন্তু দুর্বল শরীরে পারলে না। অগত্যা দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে ঘুমোতে চেষ্টা করলে।

দেওয়ালের গায়ে একটা আলোর চাকতিকে নাচতে দেখে মিঠুন হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লে। সূয্যি মামার মুখ থেকে কখন মেঘের ওড়নাটা সরে গেছে। উঠানের একটা জলভরা বালতি থেকে আলো ঠিকরে এসে পড়েছে দেওয়ালে। উঠানে সূর্যের আলোতে আয়না ধরে দেওয়ালের দিকে ঘোরালে যেমনটি দেখায়—এও যেন অনেকটা তেমনই। ঝিরঝিরে হাওয়ায় বালতির জল একটু একটু করে নড়ছে আর সেই সঙ্গে দেওয়ালের গায়ে নাচছে চাকতিটা এবং ছোটবড় কত রকমের ঢেউ উঠছে চাকতিটার ভেতরে।

সূয্যি মামা একটু একটু করে যতই পশ্চিমে এলিয়ে পড়তে শুরু করলে ততই চাকতিটা আরও বড় হয়ে তার একেবারে মাথার কাছটিতে এসে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল সেইখানেই। আরও ভাল করে দেখতে সুবিধে হল মিঠুনের। দেখলে, কতরকমের কত ছবি ঢেউয়ের উপর ভেসে উঠছে এবং একটু পরেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। একসময় হঠাৎ মিঠুন দেখতে পেলে, চাকতির ভেতর থেকে হাসতে হাসতে একে একে বেরিয়ে এলে সাতরঙের সাতটি ফুটফুটে মেয়ে। সবার আগে বড় ও লালরঙের একটি মেয়ে এবং তার পেছনে পেছনে ইস্কুলে ড্রিলের ক্লাসের মত বড় থেকে ছোট—পরপর সার বেঁধে দাঁড়ালে। মিঠুন অবাক না হয়ে পারলে না। শুধোলে—কে গা তোমরা? কাদের বাড়ীর মেয়ে?

খিলখিল করে হেসে উঠলে সাতজন। ছড়া কেটে বললে—

স্যুয্যি মামার সাত মেয়ে মোরা
হেসে কাটাই কাল
বেগুণী, নীল, আসমানি, সবুজ
হলুদ, কমলা, লাল।
কালো আকাশ ফুঁড়ে আমরা ছুটছি সাতজনা,
আমরা মানিনা কারও মানা।

—তোমরা কেন ছুটে চলেছো ? জিজ্ঞাসা করলে মিঠুন।

সবার বড় লাল মেয়েটি বললে—যেখানে যত জীব—যত গাছপালা আছে, তাদের সবার বুকে শক্তি যোগাতে, সবার মুখে হাসি ফোটাতে, আর চারদিকে রঙের জৌলস আনতে, আমাদের কেবলই ছুটে চলতে হয়। এই ছুটে চলার মধ্যে কোন বিরাম নেই।

মিঠুন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—চারদিকে যে এত রঙের বাহার—তার মূলে কী তোমরা ?

সেই লাল মেয়েটিই বললে—ঠিক তাই।

—সবুজ গাছপালা, সোনালী ধানের ক্ষেত, সাদা বক আর কাশফুল, রঙ-বরঙের ফুল-পাখী-প্রজাপতি, কালো কোকিল-কাক-সবার মূলে আছো তোমরা ?

—হ্যাঁ গো, আমরাই।

মিঠুন এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—তোমরা চারদিকটা এত রঙে রঙে সাজিয়েছো, আমি তাদের দেখতে পাইনা। অথচ রঙ আমার কী যে ভালো লাগে!

—কেন মিঠুন, কেন দেখতে পাওনা ?

—আমাকে যে সবসময় অসুখে ভুগতে হয়। তাইতো ঘরের বাহিরে পা দিতে মানা, রোদে ঘুরতে মানা, সাঁঝ-সকালে ছাদে যেতেও মানা। কিন্তু দেখেছো ও পাড়ার ছেলেমেয়েদের! তারা মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এন্তার বৃষ্টিতে ভিজছে, জলে ডুবছে, রোদে ছুটোছুটি করছে, তাদের অসুখ হচ্ছেনা। অসুখটা যেন আমার জন্যেই বাঁধা।

খিলখিল করে হেসে উঠলে মেয়েরা। হাসি থামলো বেগুনী মেয়েটি বললে—ঘরে বসে না থেকে সকাল-সাঁঝে যারা খোলা জায়গায় গিয়ে আমার পরশ নেয় তাদের অনেক রোগকে আমি সারিয়ে দি। তুমি ঘুরবে, বেড়াবে, মাঠে-মাঠে ছুটোছুটি করবে, রোদ বৃষ্টিকে সইয়ে নেবে, তাহলে তোমার আর অসুখ করবেনা।

মিঠুন অনুনয়ের সুরে বললে—তোমরা দাওনা আমার অসুখটাকে সারিয়ে! আমি ঘুরবো, জলে সাঁতার কাটবো, কাঠবেড়ালিদের পেছু পেছু ধাওয়া করবো, আর ফুল-পাখী-প্রজাপতিদের ভাল করে দেখবো।

হাসি হাসি মুখে সাত বোনই ঘিরে ফেললে মিঠুনকে। জোড়ায় জোড়ায় হাত ছোঁয়ালে মিঠুনের বুকে, কপালে ও মাথায়। গান ধরলে—

আমরা তোমাদের সূয্যি মামার মেয়ে।
ঢেউয়ের দোলায় দোল খেয়ে খেয়ে
লক্ষ ও ছিয়াশি হাজার মাইল বেগ নিয়ে
আকাশের বুকে পড়ছি মোরা ছড়িয়ে।
ন'কোটি মাইল পথ পেরিয়ে
আরও তিরিশ লক্ষ ছাড়িয়ে
এসেছি তোমাদের পৃথিবীতে মোরা
খুশির গান গেয়ে।
আমরা তোমাদের সূয্যি মামার মেয়ে।

দেখতে দেখতে পশ্চিমের আকাশটা রাঙা হয়ে উঠলে। একসময় সিঁদুর রাঙা মেঘের রথে আরোহণ করলেন সূয্যি মামা। মেয়েদের ডাক দিলেন—ওগো মেয়েরা, ফিরে এসো! ফিরে এসো! যাওয়ার সময় যে বহে যায়।

চঞ্চল হয়ে উঠলে মেয়েরা। বললে—তুমি এখন ঘুমাও মিঠুন, আমরা আসি।

হৈ হৈ করতে করতে মেয়েরা ছুটে গেল। আর ঠিক সেই সময়

মিঠুনের মা এসে ডাকলেন—মিঠুন, মিঠুন, আর ঘুমিওনা। জেগে ওঠো, ওষুধ খেতে হবে যে!

মিঠুন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে মায়ের দিকে। তারপর চোখ-দুটো রগড়ালে ভাল করে। অবশেষে খাটের উপর উঠে বসলে।

মা এবার মিঠুনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আমার হাত ধরে খাট থেকে নেমে এসোতো দেখি সোনা!

মিঠুনের শরীরটা কেমন যেন হাল্‌কা হাল্‌কা মনে হলো। তড়াক্ করে লাফ দিয়ে নেমে এলে খাট থেকে। মা হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

মিঠুন মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—মাগো! আমি এবার ভাল হয়ে গেছি। সূয্যি মামার মেয়েরা এসে আমার অসুখ সারিয়ে দিয়ে গেছে। বলেছে, সাঁঝ-সকালে বেড়ালে কখ্‌খনো অসুখ করবেনা। তুমি দেখে নিও, কাল সকালেই আমি শিউলি তলায় ফুল কুড়াবো, মাঠময় ছুটোছুটি করবো, আর ও পাড়ার দুগ্‌গা মাসীর বাড়ী থেকে দুধ নিয়ে আসবো।

মা আলতোভাবে মিঠুনের কপালে ডানহাতের চেটোটা ছোঁয়ালেন। দেখলেন, মিঠুনের গায়ে সত্যিই জ্বর নেই। অবাক হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন মিঠুনের মুখের দিকে।

মুক্তোমালা

জেলের মেয়ে মুক্তোমালা।

সাগরতীরে বালিয়াড়ির এককোণে—কেয়াঝোপের আড়ালে তার ভাঙ্গা কুঁড়ে। সেবার বর্ষাকালে সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নৌকাডুবি হয়ে মারা গেছে তার বাপ, মাকেও খেয়েছে হাঙরে। ভাই নেই, বোন নেই, কাছের কিংবা দূরের কোন আত্মীয়ও নেই। আকাশের চাঁদ-সুরুষের বরং একটা অদৃশ্য বাঁধন আছে, মুক্তোমালার তাও যেন নেই। একা, একেবারে একা সে।

পোড়া পেটের চাহিদা মেটাতে মুক্তোমালাকে মাছ ধরতে হয়। ভাটার যখন পুরোপুরি টান পড়ে তখন জেলেপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খালের মুখে ছাঁকনি জাল পেতে কুচো মাছ ধরে। জেলেদের আড়তে বিক্রি করে যা পায়, তাতেই কোনরকমে পেট চলে যায় তার। রাতে ঘুমোয়—পাশের এক কুঁড়েতে, শুভো ঠাকুমার কাছে। হাতে যখন কাজ থাকেনা, তখন ছুটে যায় সাগরতীরে—জলের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকে, সাগরের গোঁ-গোঁয়ানি শোনে, আর বারে বারে সাগরকে অভিশাপ দেয়।

সেদিন ছিল চাঁদ্‌নী রাত। চারদিকে রূপালী আলোয় থৈ-থৈ বন্যা। মুক্তোমালা সন্ধ্যায় ভরা জোয়ারের সময় থেকে সাগরতীরে জলে পা ডুবিয়ে বসে ছিল। দুপাশে জলের দাগের মুখে বহুদূর অবধি দপদপ করছিল লক্ষ জোনাকির আভার মত নীল নীল আলোর ফুলকি, পায়ের কাছে আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর মাথা ভেঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে আসছিল তূলোর আঁশের মত টুকরো টুকরো ফেনা, নীল আলোর রেখা ছড়াতে ছড়াতে হাউইর মত ছুটোছুটি করছিল কুচো কুচো চিংড়িরা, লাল জাজিমের মত সাগরবেলাটা ঢেকে গিয়েছিল লাল লাল কাঁকড়ায়, খুশিতে যেন ঝলমল করছিল সাগর ও সাগরবেলা। শুধু খুশির

আমেজ ছিলনা মুক্তোমালার মনে। সারাদিন সে আজ মাছ পায়নি, মুদির দোকান থেকে ধারে চাল এনে ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেয়েছে। মলিন মুখে তাই বসে আছে ভাটার অপেক্ষায়।

সঙ্গীসাথীরা আসবে একটু পরে—ভাটার পুরোপুরি টান পড়লে। আজ শুভোঠাকুমা বাড়ীতে নেই। ঘরে একা একা মোটেই ভাল লাগছিলনা। তাই চলে এসেছে একেবারে ভরা জোয়ারের সময় থেকেই। নির্জন সাগরতীতে কেবলই ঘুরে ঘুরে মনে পড়ছিল তার নিজের কথা, তার বাবা ও মায়ের কথা এবং জেলেপাড়ার ছেলেমেয়েদের কথা। হায়রে হায়! সোনা, হারু, রতন কিংবা মীনাদের মত তারও যদি বাপ অথবা মা একজনও কেউ বেঁচে থাকতো!

এক সময় চাঁদের আলোয় মুক্তোমালা দেখলে, দূরে—বহুদূরে—সাগরবুকে কালোপনা কী একটা যেন মাথা তুললে। আরও-আরও উপরে তুললে মাথা। শেষে কোমর অবধি ডুবিয়ে রেখে লম্বা লম্বা হাতদুটোকে নাড়লে কয়েকবার। মুক্তোমালার মনে হল, যেন একটা কালো মেয়ে আদুড় গায়ে কোমরজলে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকলে হাতছানি দিয়ে।

কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো মুক্তোমালার। সে শুভো-ঠাকুমার কাছে শুনেছিল, সাগরেও ডাইনীরা বাস করে। জ্যোৎস্নারাতে কখনও একা একা, কখনও বা দলে দলে সাগরবুকে ভেসে থাকে আর তীরের দিকে তাকায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খোঁজ করতে। আবার কখনও লোকজন না থাকলে তীরের দিকে ছুটে আসে এবং ছেলে ধরার জন্যে বালিয়াড়ির উপর চুপচাপ শুয়ে থাকে। একা একা কোন ছেলে কিংবা মেয়েকে পেয়ে গেলে আর রক্ষে নেই। মাকড়সারা যেমন পোকামাকড়দের ভেতরের সার জিনিসটুকু খেয়ে খোলসটা ফেলে দেয়, এরাও তেমনই কচি কচি ছেলেমেয়ের রক্ত ও মাংস শুষে নেয় এবং হাড়গোড় ও চামড়াটাকে ফেলে দেয়।

মুক্তোমালা ঝটিতে পা দুটিকে জলের কিনারা থেকে সরিয়ে নিলে এবং পালাবার উপক্রম করলে। এমনসময় তার কানে ভেসে এলো

বাঁশির মত মিষ্টি সুর। মনে হল, কারা যেন দূরে—বহুদূরে একনাগাড়ে বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। সেই সুরের যাদুতে হঠাৎ তার দেহমন কেমন যেন অবশ হয়ে পড়লো, একেবারে নিথর হয়ে গেল পা দুটো, পালাতে ভুলে গিয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে।

হঠাৎ একসময় সেই বাঁশির সুরটা থেমে গেল। আর ঠিক তক্ষুনি এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল, মুক্তোমালার। দেখলে, সাগরের জলকে দু ফাঁক করে আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে তারই দিকে ছুটে আসছে বিশাল এক হাতুড়িমুখো হাঙর। আর তাকে বাধা দিচ্ছে বিকট দর্শন কালো কালো কতকগুলো জানোয়ার।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে একটা তীব্র ঝাপটা এসে লাগলো মুক্তোমালার গায়ে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর সংজ্ঞাও হারিয়ে ফেললে।

সকালে সোনাগলা রোদ্দুরের পরশ পেয়ে জ্ঞান ফিরে পেলে মুক্তোমালা। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলে সে। সাগরবেলায় শক্ত পাথরের উপর উঠে বসতেই বুঝতে পারলে, একেবারে অজানা ও অচেনা এই সাগরবেলা। এখানে এককণাও বালি নেই, ধূসর ধূসর বালিয়াড়ি নেই, সারিসারি কেয়াঝোপ নেই, লাল লাল কাঁকড়া নেই। জেলেদের একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে কিংবা একখানা ভাঙ্গা নৌকা, কিচ্ছুটি চোখে পড়ল না। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল জল, জল আর জল। ডাইনে ও বাঁয়ে ধূ ধূ সাগরবেলা। আর পেছনে সাগরবেলা থেকে একটু দূরে যেন আকাশের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু পাহাড়। মুক্তোমালার মনে হল, পাহাড়ের ওপারে নিশ্চয়ই কোন দেশ আছে। কিন্তু পাহাড় ঘেরা এ কোন্ আজব দেশ! কারা থাকে ওখানে! রাক্ষস না দৈত্য! সাগরবেলায় লোকজনইবা নেই কেন? রাক্ষসের দেশ বলে?

এবারও শুভো ঠাকুমার কথা মনে পড়লো তার। ঠাকুমা মাঝে মাঝে বলতেন, সাত সাগর আর তের নদীর পারে পাহাড় ঘেরা এক দেশে থাকে রাক্ষসেরা। মায়াবী তারা। নানান বেশে পৃথিবীতে

ঘুরে বেড়ায় এবং ছেলেমেয়েদের জোর করে অথবা ভুলিয়ে ভালিয়ে ধরে নিয়ে যায়। তারপর পাথরের পাঁচিল ঘেরা তাদের রাজ্যে ছেড়ে রাখে। এবং দরকার মত তাদের এক-একটিকে ধরে ধরে খায়। সেখান থেকে পালিয়ে আসার সাধ্য কারও নেই।

ভয়ে মুক্তোমালার গায়ে কাঁটা দিলে। তবু ভাবতে শুরু করলে—সে কেমন করে এলে এখানে! কে আনলে তাকে এবং কেমন করেই বা আনলে?

হঠাৎ গতকাল রাতে শোনা সেই বাঁশির সুর কানে আসতেই মুক্তোমালার মনে ভিড় করলো অনেক কথা। সেই ছাঁকনিজাল হাতে জলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকা, সেই ডাইনীর ঘন ঘন হাত নাড়া, সেই হাতুড়িমুখো হাঙর, অবশেষে তার লেজের তীব্র ঝাপটায় জলে পড়ে যাওয়া, সবই। কিন্তু তার পরের কথা কিচ্ছুটি জানেনা। তবে কী সেই হাঙর অথবা সেই ডাইনীর রূপ ধরে রাক্ষসরা এসেছিল তাকে ধরবে বলে? যদি রাক্ষসরা তাকে ধরে নিয়ে এসেছে তাহলে ওরা গেল কোথায়?

একসময় বাঁশির সুরকে অনুসরণ করতে গিয়ে দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হল জলের উপরেই। দেখলে, মস্তবড় এক লম্বা ও চ্যাপ্টা ধরণের কুচকুচে কালো এবং কিম্ভূতকিমাকার একটা জীব জলের গায়ে গায়ে একেবারে যেন লেপ্টে আছে। চেহারাটা গতকালের দেখা সেই ডাইনীর মত নয় কিংবা হাতুড়ীমুখো হাঙরও এটি নয়। কোন রাক্ষস বলেও মনে হলনা জানোয়ারটিকে। ধূসর কালো গায়ের রঙ, মাছের মত লেজ, তেলতেলে গা, এবং হাঁসের ঠোঁটের মত মুখ। মাঝে মাঝে জলের উপরে মাথা তুলছে আর বাঁশির সুর ছড়াতে ছড়াতে পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

জানোয়ারটিকে কখনও না দেখলেও চিনতে ভুল করলেনা মুক্তোমালা। এদের গপ্‌পো জেলেদের মুখে অনেক—অনেক শুনেছে সে। শুনেছে, সাগরে হিংস্রুটে হাঙ্গররা যেমন বাস করে তেমনই বাসকরে হৃদয়বান কিছু কিছু শুশুক। এরা মানুষকে ভালবাসে।

আর সবচেয়ে বেশী ভালবাসে মানুষের ঘরের ছোটছোট ছেলেমেয়েদের। ছোটদের সঙ্গে ওরা খেলা করতে চায়, আড্ডা দিতে চায়, পিঠে নিয়ে এন্তার ঘুরে বেড়াতে চায়। সাগরে কাউকে বিপদে পড়তে দেখলে ওরা আপনিই ছুটে আসে এবং প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে। জগতে এদের চেয়ে দয়ালু নাকি কেউ নয়।

মুক্তোমালার কাছে সব ব্যাপারটা এবার দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠলো। বুঝতে পারলে, গতকাল সেই রক্তখেকো হাঙ্গরটা তার দিকে তেড়ে এলে এরা দল বেঁধে লড়েছে, বাঁশির সুর ছড়িয়ে সাবধান করে দিয়েছে, শেষে হয়ত উপায় না দেখে হাঙ্গরের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে তাদেরই কেউ একজন টেনে নিয়ে ছুটে এসেছে এখানে।

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো মুক্তোমালার। চরম দুঃসময়ের এই বন্ধুটিকে কীভাবে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে—তা ভেবে ঠিক করতে পারলে না। শুধু জলের কিনারায় এসে দাঁড়ালে। তখন শুশুকটাও একেবারে কাছে—তার নাগালের মধ্যে এসে আরও জোরে জোরে বাঁশির সুর ছড়াতে শুরু করলে।

কী ভেবে মুক্তোমালা তার ডান হাতটা ছোঁয়ালে শুশুকের পিঠে। তার চোখ থেকে ভোরের শিশির বিন্দুর মত টুপটাপ করে ঝরে পড়লে কয়েক ফোঁটা জল। আর শুশুকটিও সীমাহীন আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলে মধুর মধুর বংশিধ্বনির মাধ্যমে।

কতক্ষণ কেটে গেল। একসময় মুক্তোমালা যেন আপনমনে উচ্চারণ করলে—এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে শুশুক? এখানে লোক নেই, জন নেই, একটা সবুজ ঘাস পর্যন্তও নেই। আমি কী খাবো বলতে পারো?

শুশুক মুক্তোমালার কথাগুলো যেন বুঝতে পারলে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে আগের মত বাঁশির সুর ছড়াতে ছড়াতে কোথায় ছুটে চলে গেলে। আর মুক্তোমালা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলে সাগরের দিকে।

ধীরে ধীরে বেলা বেড়ে উঠলো কিন্তু শুশুক ফিরে এলেনা। ততক্ষণে ক্ষিধেয় তার নাড়িভূঁড়িগুলো দলা পাকাতে শুরু করে দিয়েছে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ।

উঠে দাঁড়ালে মুক্তোমালা। ঝাপসা চোখে এদিকে ওদিকে পায়চারি করলে কিছুক্ষণ। যদি কারও একটা ঘর চোখে পড়তো তাহলে দু-চারখানা কাজ করে দিয়ে অন্ততঃ একবেলার মত পেটের ভাতটা জোগাড় করে নিতে পারতো। কিন্তু হায়! একটা কুঁড়েও চোখে পড়লো না! ধূধূ সাগরতীরে দুপুরের কড়া রোদ্দুর থেকে মাথা বাঁচাতে জেলেদের পরিত্যক্ত একটা ভাঙ্গা আস্তানাও না। একটু মিঠে জল—তাও নেই কোথাও। মুক্তোমালা খুব করে কাঁদলে এবং সাগরকে বারে বারে ধিক্কার দিলে। অবশেষে অবসন্ন শরীরটাকে টেনে টেনে তার পূর্বের জায়গাটাতে বসলে।

এবার মাথার উপরে সূর্য যেন আগুন ঝরাতে শুরু করলে। তপ্ত এক বালির খোলার মত হয়ে উঠলো সাগরবেলা। মুক্তোমালা আর কিছুতেই সেখানে বসে থাকতে পারলেনা। অগত্যা কোমর পর্যন্ত সাগরজলে ডুবিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কাঁদার পর মুক্তোমালার চোখদুটো শুকনো হয়ে উঠেছে, তেষ্টায় ঠোঁট দুটোও শুকনো, আর হাত-পা গুলো কেমন যেন শরীরের ভেতরে সেঁধিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে। নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে মুক্তোমালা ভাবলে মনে মনে—যার বাপ নেই, মা নেই, জগতে যার কোন বাঁধন নেই, তার বেঁচে থেকেই বা কী লাভ? আসুক সেই রক্তখেকো হাঙ্গর, আসুক সেই ডাইনী, তার শরীরটাকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলুক! সে-চিৎকার করবে না, একবার উঃ আঃ ও করবে না।

ঠিক সেই সময় মুক্তোমালা দেখলে, কোথা থেকে একদল পাখী কিচির-মিচির শব্দ করতে করতে অদূরে সাগরতীরে নেমে পড়লে এবং শুরু করে দিলে জল খেতে। কী ভেবে মুক্তোমালাও এক আঁজলা জল নিয়ে পুরে ফেললে মুখে। কিন্তু এ কী? এটি না

সাগর! তবে এখানাকার জল নদীর জলের মত কেন এত মিঠে?

জল খাওয়া মাথায় উঠলো মুক্তোমালার। কেবলই ভাবতে লাগলে, সাগরের জল কী কখনও মিঠে হয়? শুশুক কী তার অচেতন দেহটাকে এতদূরে বহে নিয়ে আসতে পারে? একী স্বপ্ন না সত্য?

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাই এবার তার কাছে কেবল হেঁয়ালির মত ঠেকতে লাগলো। সে জেগে আছে কিনা জানার জন্যে নিজের দেহে বারবার চিমটি কাটলে, আঁচড়ালে, কামড়ালে, হাসলে, কাঁদলে, তবু স্বপ্ন না সত্য কিছুতেই ঠিক করতে পারলেনা।

একসময় সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলান দিয়ে পড়লো। দূরে—বহুদূরে—সাগরবুকে জেগে উঠলো কালো বিন্দুর মত কী একটা জিনিস। তারপর ধীরে ধীরে সেই বিন্দুটি বড় হতে হতে একটা ছোট্ট জাহাজের রূপ নিলে। মুক্তোমালা হাঁ করে তাকিয়ে রইলে সেই দিকে।

কতক্ষণ পরে জাহাজটা মুক্তোমালার কাছ থেকে মাত্র শ'খানেক হাত দূরে এসে নোঙর করলে। আরোহীদের কয়েকজন একটা ছোট্ট নৌকা ভাসিয়ে হাজির হলে মুক্তোমালার কাছে। নিজেদের দিকে তাকিয়ে কী সব বলাবলি করলে, মুক্তোমালাকেও কী যেন জিজ্ঞাসা করলে। মুক্তোমালা তাদের ভাষা বুঝতে পারলেনা। তবু নিজের ভাষায় খেতে চাইলে।

মাত্র একজন লোক বুঝতে পারলে মুক্তোমালার কথা। লোকটি তখন সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করলে, মুক্তোমালাকে খেতে দিলে, অবশেষে বললে—তোমাকে আমাদের রাজার কাছে যেতে হবে।

মুক্তোমালা সম্মতি জানালে লোকটির কথায়।

সূর্য তখন অস্ত যাওয়ার মুখে। লালে লাল হয়ে উঠেছে পশ্চিমের পাহাড়গুলো। দেশজুড়ে নেমেছে পাহাড়ের ছায়া। ঠিক সেই সময় জাহাজ এসে ভিড়লে সাগরতীরে বিরাট একটা বন্দরে। মুক্তোমালাকে সঙ্গে করে নেমে এলে সেই একটি মাত্র লোক—যে মুক্তোমালার কথা বোঝে।

মাটিতে পা দিয়েই মুক্তোমালা অবাক হয়ে গেল। ভেতরের দিকে পাথরের বাঁধাই যে ঝকমকে রাস্তাটা গেছে, তার দুপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর কেবল কারখানা আর কারখানা। কাচের ঘরগুলোতে থরে থরে সাজানো ছোট বড় হরেক রকমের মুক্তো, এখানে ওখানে বরফ ও মাছের পাহাড় আর অজস্র লোক কাজ করে চলেছে। মুক্তোমালা আরও অবাক হলে, যখন দেখলে জলের স্রোতের মত মানুষ কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু মুখে কারও কথা নেই। নেই কোনো কোলাহল। মাথার উপরে উড়োজাহাজের শব্দ, কারখানায় কারখানায় ঘর্ঘরধ্বনি, কানফাটানো জাহাজের বাঁশি, মাটিতে বাস-লরির আওয়াজ ছাড়া মানুষের গলার স্বর শোনা গেল না।

লোকটার পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে মুক্তোমালা এক সময় এক প্রাসাদের সামনে এসে পড়লে। ভেতরে ঢুকতেই মুক্তোমালার বিস্ময় আরও বেড়ে উঠলে! চারদিকে কেবল মুক্তার ছড়াছড়ি। প্রাসাদজুড়ে মুক্তোর মালা, প্রবেশপথের দুধারে সারিসারি মুক্তোর তৈরি গাছে মরকতমণির পাতা, হীরে মাণিকের ফল। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

চার চারটে দেউড়ি পেরিয়ে তারা প্রবেশ করলে চমৎকার এক সভাকক্ষে। সেখানে মুক্তোর তৈরি সিংহাসনে অসে আছেন মুণিমুক্তার সাজ পরে স্বয়ং রাজা। তাঁর পাশে মুক্তাখচিত আসনগুলিতে পরপর বসে বৃদ্ধ মন্ত্রী এবং সভাষদরা।

রাজা ও সভাষদরা ভিনদেশী মুক্তোমালাকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন সঙ্গের লোকটির দিকে। লোকটি নিজেদের ভাষায় কী সব বলাবলি করার পর মুক্তোমালাকে জানালে রাজার কথা। দোভাষীর কাজ করলে লোকটি এবং মুক্তোমালা করুণ কণ্ঠে জানালে তার মন্দভাগ্যের ইতিহাস। সেই মাছ ধরার জন্য সাগরতীরে বসে থাকা, ডাইনীকে দেখা, শুশুকের পিঠে চেপে এতদূরে আসা, কোনকিছুই বাদ দিলেন না।

এবার আলোচনাসভার মুখ্যবিষয় হয়ে উঠলো মুক্তোমালা।

মন্ত্রীমশাই বললেন—শুশুকের কথা যখন মেয়েটা বলছে, তখন মিথ্যে নাও হতে পারে। কেননা সাগরে মানুষকে সাহায্য করতে ওদের জুড়ি কেউ নয়। ওরাই ডুবোপাহাড়ের পাশে জাহাজকে পথ দেখায়, ডুবুরীদের মুক্তোর সন্ধান এনে দেয়, গভীর সমুদ্রের মাছদের ভুলিয়ে ভালিয়ে জেলেদের নাগালের মধ্যে এনে দেয়, জাহাজডুবি হলে মানুষকে পিঠের উপর তুলে নেয়, অতএব ওদের দ্বারা সবই সম্ভব। কিন্তু ঐ ডাইনীর কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারছিনা।

এক বয়স্ক নাবিক ছিলেন সেখানে। তিনিই বললেন—ডাইনী, ফাইনী সব বাজে কথা। মেয়েটা ডুগংএর কথা বলছে। দূর সাগরের বুকে কতবার আমরা দেখেছি ওদের। জোৎস্নারাতে ওরা কোমর থেকে উপরের দিকে জলের উপরে রেখে যখন ভেসে থাকে তখন দেখলে একটা মেয়েমানুষ বলেই মনে হয়। আর তার দুপাশের পাখনা দুটোকে মনে হয় মানুষের হাতের মতো। দক্ষিণ সাগরে কালেভদ্রে ওদের দেখা যায়।

মুক্তোমালাকে সঙ্গে করে যে লোকটি এসেছিল সেও বললে—শুশুকের কথাটা কিন্তু ঠিকই। কেননা, একটা শুশুকই আমাদের জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল ঐ মেয়েটার কাছে।

মন্ত্রীমশাইর সন্দেহ দূর হল কিন্তু সভাষদরা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁরা বললেন—শুশুক, ডাইনী, হাঙ্গর, সবই বানানো কথা। আসলে মেয়েটা কোন বিদেশী গুপ্তচর।

মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে বললেন—না, এতটুকু মেয়েটা গুপ্তচর হতেই পারে না।

রাজা বললেন—সন্দেহ যখন জেগেছে, তখন মেয়েটাকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। প্রথমে ওকে শেখানো হোক আমাদের দেশের ভাষা। তারপর একদিন কায়দা করে ওর মনের খবরটা ঠিক আদায় করা যাবে।

রাজার আদেশে ঐ লোকটি এবং আরও দশজন পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন মুক্তোমালাকে এ দেশের ভাষা শেখাতে। প্রায় একমাস পরে

মুক্তোমালার মুখে আধো আধো বুলির মত এলো এখানকার ভাষা। তখন পুনরায় তাকে হাজির করা হলো রাজসভায়। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোন দেশের মেয়ে?

মুক্তোমালা বললে—যে দেশে মাঠে মাঠে কেবল সোনার ফসল, নদীতে নদীতে মিঠে মিঠে জল, দিকে দিকে কেবল সবুজের সমারোহ আর পাখীদের মনমাতানো গান—আমি সেই দেশেরই মেয়ে।

রাজা নাক সিঁটকালেন। বললেন—এই কী একটা দেশ হলো? দেখেছো, আমাদের দেশকে! এখানে সোনার চেয়েও দামী মুক্তোর পাহাড় জমেছে, মাটির ভেতরে হীরের ছড়াছড়ি। এদের এককণার বিনিময়ে বিদেশীরা হাজার হাজার বস্তা ফসল দিয়ে যায়। আর মিঠে জলের কথা বলছো? আমাদের এখানকার সাগর তলায় রাশি রাশি মিঠে জলের ফোয়ারা থাকায় সাগর পৃষ্ঠও ভরে গেছে মিঠে জলে। নদীর অপেক্ষা করতে হয় না আমাদের। তা যাক্, এমন সুন্দর দেশে কী তুমি থাকতে চাও?

মুক্তোমালা বললে—না থেকে উপায় কী মহারাজ! কে আমায় ছেড়ে আসবে আমাদের দেশে!

—ঠিকই বলেছো। কাজ কামাই করা এদেশের নিয়ম নয়। তা-তুমি কাজ করতে পারবে তো?

—অবশ্যই করবো। আমরা কাজ জানি, কাজকে ভালবাসি, আর কাজ না করে বসে বসে খাওয়াকে প্রচণ্ড ঘৃণা করি।

রাজার আদেশে মুক্তোমালাকে মুক্তোচাষের কাজে নিয়োগ করা হলো। কয়েকদিনের ভেতরেই মুক্তোমালা বুঝতে পারলে এদেশের হালচাল। এখানকার বড় কাজ হচ্ছে সাগর থেকে মুক্তো সংগ্রহ করা এবং চৌবাচ্চায় চৌবাচ্চায় মুক্তোর চাষ করা। বেজায় বুদ্ধিমানও এরা। সাগরগর্ভ থেকে তুলছে সোনা ও তরল সোনা। যন্ত্র দিয়ে দূর সাগর থেকে লোনা জল এনে সেখান থেকে নুনকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গড়ে তুলেছে শিল্পের পর শিল্প, সাগর জল থেকে বিদ্যুৎও তৈরি করছে আর বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে ভারি জলকে। সাগরই ওদের সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দিয়েছে জ্বালানীর খরচ। শুধু কী তাই? সাগর থেকে রাশি রাশি মাছ তুলছে, অতল সাগরগর্ভ থেকে তুলছে নানা ধরনের নুড়ি, আর তুলছে প্রচুর পরিমাণে আগাছা। তাই কারখানায়

কারখানায় ভরে গেছে দেশটা। মাটির চিহ্নমাত্র নেই, সবটুকু ঢাকা পড়ে গেছে সম্পদে।

এত সম্পদ, তবু কাজের বিরাম নেই। কাজই ওদের জীবন। কাজের চাপে জন্ম, মৃত্যু, স্নেহ, ভালবাসা কোনকিছুই ওদের মনকে নাড়া দিতে পারে না। দিনে রাতে পালা করে শুধু কাজই করে, গলা থেকে একটা গানের কলিও বেরোয় না, কোন উৎসবেরও আয়োজন হয় না।

কয়েকটা দিনেই মুক্তোমালা হাঁপিয়ে উঠলে। মনটা তার চাইলে বিদ্রোহী হতে, চাইলে কাজের মধ্যে ছন্দপতন ঘটাতে। মুক্তোচাষী অন্যান্য মেয়েদের বোঝাতে চাইলে কেবল খাওয়া, কাজকরা এবং শরীরচর্চাটা জীবন নয়। জীবনের গতি আছে, ছন্দ আছে, মাধুর্যও আছে।

কিন্তু কেউ শুনলেনা মুক্তোমালার কথা। একদিন তাই চৌবাচ্চায় ঝিনুকের গায়ে আলতো ভাবে আঁচড় কাটতে কাটতে ছড়ার সুরে গান ধরলে—

সাতসমুদ্দুর শেষে,
মুক্তোদ্বীপে এসে
মুক্তোমালা শুক্তি পোষে
মুক্তোহাসি হেসে।

সঙ্গে যারা কাজ করছিল তারা মুক্তোমালার গান শুনে শিউরে উঠলে। চিৎকার করে বললে—মুক্তোমালা, মুক্তোমালা, গান থামাও। এদেশে গানের নিয়ম নেই। আমরা কাজের ভেতরেই আনন্দ খুঁজি, গানের ভেতরে নয়।

মুক্তোমালা কান দিলেনা তাদের কথায়। হাসিতে মুক্তো ছড়াতে ছড়াতে পুনরায় সেই একই সুরে গান ধরলে—

গলায় মুক্তোমালা,
হাতে মুক্তোর বালা,
মুক্তোমালা মুক্তো যোগায় মুক্তো রাজার দেশে,
সাত সমুদ্দুর শেষে।

চঞ্চল হয়ে উঠলে সবাই। বারবার বললে—এ ভাল নয়, ভাল নয়। নিয়ম ভাঙ্গা কখনোই ভাল নয়।

মুক্তোমালা বললে—নিয়মতো ভাঙ্গছিনা ভাই। শুধু কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান গাই।

কাজের মাঝে গানের কথা শুনে কাঁপতে লাগলে সবাই। দুহাতে কান বন্ধ করে বললে—আর গান কখনও নয়।

পরের দিন শুধু গান নয়, গানের সঙ্গে নাচও জুড়ে দিলে মুক্তোমালা। সে-নাচ—জেলেপাড়ার উৎসবের দিনের নাচ, মাছ ধরার মহড়ার নাচ, সাগরবেলা থেকে খুশি হয়ে ঘরে ফেরার নাচ। নেচে নেচে ঝিনুকদের পরিচর্যা করতে গান ধরলে—

ও আমার মাটির দেশের মায়ারে,
তাল খেজুরের ছায়ারে,
কেন আমায় ডাকিস বারে বারে।
সাদা সাদা টোপর মাথায় কেয়াগাছে ঠাসা,
নদীর তীরে পাকুড় শাখায় শঙ্খচিলের বাসা।
শিরীষ, বকুল ডালেরে,
দোয়েল কোয়েল ডাকেরে,
চোখ গেলদের করুণ-সুরে মন উতলা করেরে।
ও আমার মাটির দেশের মায়ারে।

একদিন রাজার কাছে নালিশ গেল, মুক্তোমালা নিয়ম ভেঙ্গেছে। সে নাচে, সে গান গায়।

রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে ডাকলেন মুক্তোমালাকে। জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি নাচো, তুমি গান গাও?

মুক্তোমালা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ!

—বটে এত দুঃসাহস তোমার?

—দুঃসাহস কেন মহারাজ? একমাত্র খাঁচার পাখী ছাড়া সবাইতো গান গায়? শুভো ঠাকুমা বলতেন, মানুষের গলায় ভাষা আসার আগেই গান এসেছিল।

রাজা কটমট করে তাকালেন মুক্তোমালার দিকে। বললেন—ওসব বাজে কথা থাক। আগে তুমি নিয়ম কেন ভেঙ্গেছো বল?

মুক্তোমালা বললে—মহারাজ, নিয়ম যখন আছে তখন নিয়ম ভাঙ্গারও তো নিয়ম আছে? রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন। চিৎকার করে বললেন—তোমাকে কঠোর সাজা দেবো। চিরকালের জন্যে রুদ্ধ করে দেবো তোমার কণ্ঠের গান। মৃদু হাসলে মুক্তোমালা। বললে—কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হওয়ার আগে

পর্যন্ত আমি গেয়ে যাবো গান। গান আমায় শক্তি জোগায়, গান আমার কাজে প্রেরণা দান করে।

এমন সময় এক অনুচর হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করলে রাজসভায়। বললে—এ রাজ্যে আর নিয়মশৃঙ্খলা নেই মহারাজ! ঐ মেয়েটাই সব ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন করে?

অনুচরটি বললে—মুক্তোচাষী সব মেয়েই নাচছে, গান গাইছে, হাসছে।

মুক্তোমালা হাসি হাসি মুখে বললে—মহারাজ, দেশটা এবার বেঁচে গেল। এবার অনুমতি দিন, সবার সামনে আমি আবার গান ধরি। এ গান বেঁচে থাকার গান, শেষ রাত্রির ঘুম ভাঙ্গানি গান, আমার হৃদয় মথিত করা গান। দিন মহারাজ, আমায় অনুমতি দিন!

সভা নিস্তব্ধ। কারও মুখে কোন কথা নেই। রাজা রাগে ফুলতে ফুলতে পাশের এক অনুচরকে আদেশ দিলেন—এই মুহূর্তে মুক্তোমালাকে বেঁধে ফেল। ওকে যেখান থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছিল সেইখানেই সাগর জলে নিক্ষেপ করে এসো। ও মরুক!

মুক্তোমালা ঈষৎ হাসলে। বললে—আজ শেষ সময়ে আমাকে শেষ গান গাওয়ার জন্য অনুমতি দিন মহারাজ! একবার প্রাণভরে গান গেয়ে যাই।

মুক্তোমালা এবার আর রাজার আদেশের অপেক্ষা রাখলে না। সভার মাঝেই শুরু করে দিলে গান।

শোনোগো মুক্তোচাষী ভাই!
গান তোমার, গান আমার, গানে ভরা জগৎটাই।
তোমরা শোননি কী পাখীদের গান?
বরষার ঝিমঝিম, সাগরের কলতান।
আমি নিত্য শুনি হায়—
ফুলের কানে কানে ভ্রমর যে গান গায়।
ওগো মুক্তো চাষী ভাই।

রাজা চিৎকার করে বললেন—গান থামাও মুক্তোমালা! তুমি চুপ কর। অনুচরদের বললেন—আর একটুও দেরি নয়। মুখ বেঁধে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দাও সাগরে।

মন্ত্রীমশাই বললেন—এমন কঠোর সাজা নাই বা দিলেন মহারাজ!

ভেবে দেখলাম কাজের মাঝে গান, কথার ভেতরে হাসি, চলার পথে বিশ্রাম, মানুষকে কাজে প্রেরণাই দান করে। নতুন উৎসাহে উৎসাহিতও করে।

রাজা বক্র কটাক্ষে তাকালেন মন্ত্রীর দিকে। বললেন—মেয়েটা আপনার মাথাটাকেও ঘুরিয়ে দিয়েছে দেখছি!

পাত্রমিত্ররা বললেন—আমাদের কথাটা ঠিক। মেয়েটা গুপ্তচর। আমাদের দেশে কাজের মাঝে ফাঁকি দেওয়ার বিদ্যে শেখাতে এসেছে।

রাজা বললেন—ঠিক কথা!

অনুচররা মুক্তোমালার হাত-মুখ বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেল। সঙ্গে গেলেন রাজা, মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, সবাই। কিন্তু এরই মধ্যে সংবাদটা রটে যাওয়ায় কাতারে কাতারে মানুষ হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলে মুক্তোমালাকে শেষ বিদায় জানাতে।

এত লোককে জড় হতে দেখে রাজা একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কাজ ফেলে ছুটে এলে কেন?

জনতা বললে—মহারাজ! আনন্দের যে অভিব্যক্তি আছে, বিচ্ছেদের যে বেদনা আছে, তা এই মেয়েটা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। তাই তাকে শেষ বিদায় জানাতে এলেম।

ক্রুদ্ধ রাজা হুকুম দিলেন—মুক্তোমালাকে সাগর জলে বার বার ডুবিয়ে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দাও ওর কণ্ঠ। তারপর ফেলে দাও রক্তখেকো কোন হাঙরের মুখে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলুক। আর জনতা দেখে যাক অবাধ্যতার শাস্তি।

হায় হায় করে উঠলে সবাই। অনুচররা রাজার কথামত বুকসমান গভীর জলে নেমে গেলে। এমন সময় বাঁশীর স্বর ছড়াতে ছড়াতে কোথা থেকে ছুটে এলে সেই শুশুক। লেজের ঝাপটায় চোখের পলকে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে মুক্তোমালাকে তুলে নিলে পিঠের উপরে। তারপর তরতর করে এগিয়ে গেলে গভীর সমুদ্রের দিকে।

রাজা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন—দ্রুতগামী বোমারু বিমান নিয়ে এসো। ধ্বংস করে ফেলুক ঐ মুক্তোমালা এবং তার সাথী শুশুককে।

মন্ত্রীমশাই বললেন—তার আর দরকার কী মহারাজ। একদিন মেয়েটা ধূমকেতুর মত আকস্মিকভাবে এসে পড়েছিল এবং বিদায়ও নিলে আকস্মিকভাবেই। ওকে যেতে দিন। আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা করে দেখুন, কাজের মাঝে গানের প্রয়োজন কতটুকু!
